ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বিটিসিএল: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
দিপু রায়

৩০ এপ্রিল ২০১৪

বিটিসিএলঃ সুশাসনে চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারম্যান, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

এম. হাফিজউদ্দীন খান
সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

তত্ত্বাবধান
মো. ওয়াহিদ আলম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
এম. শাহজাদা আকরাম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
দিপু রায়
প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ এন্ড পলিসি

গবেষণা সহায়তায়
দিলরুবা আফরোজ

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮২৬০৩৬
ফ্যাক্স: ৯৮৮৪৮১১
ওয়েবসাইটঃ www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা এবং নিরপেক্ষতা - এই মূল্যবোধগুলোর প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ থেকে বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট। গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা, প্রচারণাসহ নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে টিআইবি একদিকে আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, অন্যদিকে তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমকে জোরদার করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

টিআইবি'র গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের একটি বিশেষ অধ্যায় হচ্ছে জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাবকারী সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ওপর নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করা ও গবেষণালব্ধ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সুপারিশ প্রণয়ন করা। এই অবস্থান থেকে সরকারি মালিকানাধীন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় বিরাজমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম এবং দুর্নীতির ধরন ও প্রকৃতি চিহ্নিত করতে টিআইবি ২০১০ সালের ২৩ মার্চ একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। উক্ত গবেষণার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)-এর ওপর এই গবেষণা। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিটিসিএলের প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা, দুর্নীতির ধরন বিশ্লেষণ করা এবং এ সকল সীমাবদ্ধতা ও দুর্নীতি রোধে সুপারিশ প্রদান করা।

বিটিসিএল পূর্বে বিটিটিবি নামে সম্পূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হত। বেসরকারি পর্যায়ে টেলিযোগাযোগ খাতের ব্যাপক বিস্তারের ফলে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ার প্রেক্ষিতে এই প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারি মালিকানাধীন লাভজনক কোম্পানিতে রূপান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে বিটিসিএল যাত্রার প্রায় ৬ বছর পার হলেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে কোম্পানিটি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারছে না। পরিচালনা পদ্ধতিতে এখনও সরকারি প্রতিষ্ঠানের চর্চা ও মূল্যবোধের আধিক্য, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়ায় প্রণোদনায় ঘাটতি ইত্যাদিসহ সুশাসনের বহুবিধ চ্যালেঞ্জ থাকায় এটি এখনও বিটিটিবি'র আদলেই চলছে। এক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ পরিবৃত্তি পরিকল্পনা প্রণয়ন করাও হচ্ছে না। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে টিআইবি আশা করে, এই প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশের আলোকে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজন এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটিকে বাস্তবেই একটি লাভজনক ও গতিশীল সংস্থায় রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের প্রোগ্রাম ম্যানেজার দিপু রায় এই গবেষণাটি সম্পন্ন করেন। এ কাজে তাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন মো. ওয়াহিদ আলম ও শাহজাদা এম আকরাম। এছাড়া প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করতে টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীরা বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও সহায়তা দিয়েছেন। টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল ও সদস্য এম. হাফিজউদ্দিন খান এই গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে প্রতিবেদনের গুণগত মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করায় আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। গবেষণায় প্রাপ্ত প্রাথমিক ফলাফল নিয়ে বিটিসিএলের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করা হয় এবং তাঁদের মূল্যবান মতামত নেওয়া হয়। এছাড়া তাঁরা বিভিন্ন সময়ে গবেষণা দলকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করায় তাদের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

বিটিসিএলের সাথে সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকরা গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে এর চলমান সমস্যা দূর করে একে আরও দক্ষ ও লাভজনক করে তুলতে পারলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে যে কোনো মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সুচিপত্র

	পৃষ্ঠা
সার-সংক্ষেপ	vii
১. ভূমিকা	০১
২. গবেষণার উদ্দেশ্য	০২
৩. টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত পূর্বের গবেষণার উল্লেখযোগ্য তথ্য	০২
৪. বিটিটিবি থেকে বিটিসিএলে রূপান্তর	০২
৫. বিটিসিএলের অর্জন	০৪
৬. বিরাজমান চ্যালেঞ্জ	**০৫**
৬.১ পরিচালনা বোর্ডের চ্যালেঞ্জ	০৬
৬.২ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) নিয়োগে জটিলতা	০৭
৬.৩ নতুন অর্গানোগ্রাম কার্যকর করার চ্যালেঞ্জ	০৭
৬.৪ জনবল সম্পর্কিত সমস্যা	০৯
৬.৫ আকর্ষণীয় বিপণন কৌশলের অভাব	১০
৬.৬ অডিট সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ	১০
৬.৭ নীতিমালা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিটিসিএলকে দুর্বল করা	১১
৬.৮ বাজারে শেয়ার ছাড়ার চ্যালেঞ্জ	১১
৬.৯ প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা	১২
৬.১০ ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রক্রিয়ায় না আসা	১২
৬.১১ ঋণ ও পেনশনের দায় এবং সরকারের নীতি অনুযায়ী অলাভজনক সম্প্রসারণ	১২
৬.১২ গ্রাহক সেবা প্রদানে সীমাবদ্ধতা	১৩
৭. বিটিসিএলের অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র	১৪
৭.১ আন্তর্জাতিক কল আদান প্রদানে বিটিসিএলের দুর্নীতি	১৪
- আন্তর্জাতিক শাখার দুর্নীতি –*বাংলাদেশে থেকে বিদেশী কোম্পানি সেজে রাজস্ব ফাঁকি*	
- আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জের দুর্নীতি –*আন্তর্জাতিক কলের রেকর্ড টেম্পারিংয়ের মাধ্যমে রাজস্ব আত্মসাৎ*	
- অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসা	
৭.২ অবৈধভাবে কোম্পানির ভূমি দখল প্রদান	১৭
৭.৩ প্রশিক্ষণে অনিয়ম	১৮
৭.৪ বদলি ও দায়িত্ব (চলতি বা অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতি	১৮
৭.৫ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের অনিয়ম-দুর্নীতি	১৯
৭.৬ পরিবহণ খাতে দুর্নীতি	১৯
৭.৭ সিবিএর হস্তক্ষেপ এবং অনৈতিক কার্যক্রম	২০
৭.৮ বাড়ি এবং রেস্ট হাউস ব্যবহারে অনিয়ম	২১
৭.৯. প্রাইভেট টেলিযোগাযোগ কোম্পানির অবৈধ প্রভাবে বিটিসিএল কর্তৃক অবৈধ সুবিধা প্রদান	২১
৮. সার্বিক পর্যবেক্ষণ	২২
সুপারিশ	২৩

সারণির তালিকা

সারণি ১: নতুন ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপন ও নতুন টেলিফোন সংখ্যা	০৫

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১: সমস্যার ধরন, ফলাফল ও প্রভাব ২২

বক্সের তালিকা

বক্স ১: ভূমি দখলে অনিয়ম-দুর্নীতির কেস ১৮
বক্স ২: সিবিএর দুর্নীতির ফলে কর্মকর্তার হয়রানি ২১

পরিশিষ্ট: ২৫
পরিশিষ্ট: ১. বিটিটিবি ও বিটিসিএলের রাজস্বের চিত্র ২৫
পরিশিষ্ট ২: বিটিসিএলের টেলিফোন গ্রাহক সংখ্যা ২৫
পরিশিষ্ট ৩: ডট পাশের ধাপ ২৬
পরিশিষ্ট ৪: অন্তর্জাতিক কল আদান প্রদানের চিত্র ২৬
পরিশিষ্ট ৫: ভিওআইপি কি? ২৬

সার-সংক্ষেপ

বিটিসিএল: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

ভূমিকা

সরকারি টেলিযোগাযোগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)' প্রধান গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। পূর্বে বিটিসিএল বিটিটিবি নামে সম্পূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হলেও টেলিযোগাযোগ খাতকে বেসরকারি পর্যায়ে বিস্তার করার ফলে প্রতিযোগীতায় টিকতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। বিটিটিবিকে মুনাফাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য ১ জুলাই ২০০৮ তারিখে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি 'বাংলাদেশ টেলিকমুনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)' করা হয়। গত ২৩ মার্চ, ২০১০ তারিখে "সরকারি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় সুশাসনের সমস্যা এবং উত্তরণের উপায়" শিরোনামে প্রকাশিত টিআইবির গবেষণায় বিটিসিএলের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম-দুর্নীতির চিত্র উঠে আসে এবং টিআইবি বিটিসিএলের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কিছু সুপারিশ প্রদান করে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো সুপারিশ বাস্তবায়নের তথ্য পাওয়া যায়নি। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে বিটিসিএল যাত্রার প্রায় ৬ বছর পার হলেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে কোম্পানিটি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারছেনা। বিটিসিএল একটি কোম্পানি হিসেবে কেন কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা চিহ্নিতকরণের জন্য টিআইবি পূর্বের গবেষণার ধারাবাহিকতায় বিটিসিএলের বর্তমান অবস্থার উপরে এই গবেষণাটি পরিচালনা করেছে। এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বিটিসিএলের কার্যকর পরিচালনায় সুশাসনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে বিটিসিএলের প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা ও বিরাজমান অনিয়ম-দুর্নীতির ধরণসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা।

গবেষণাটি একটি গুণবাচক গবেষণা। এতে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ উৎসের মধ্যে বিটিসিএল, সিএজি ও দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিটিসিএলের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যসহ অন্যান্য মুখ্য তথ্যদাতা। পরোক্ষ তথ্যের উৎসগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ওয়েবসাইট, প্রাসঙ্গিক গবেষণা ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর ও প্রবন্ধ। এপ্রিল ২০১২ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত এই গবেষণার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিবেদনে প্রকাশিত সকল তথ্য হাল-নাগাদকৃত।

বিরাজমান চ্যালেঞ্জ

সম্পদের সঠিক মূল্যায়ন, পরিচালনা বোর্ডের সঠিক কাঠামো নির্ধারণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কার, আইনী কাঠামো নির্ধারণ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের নীতিমালা নির্ধারণ, শেয়ার উন্মুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কোম্পানি হিসেবে ঘোষণার পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন হলেও বিটিসিএলের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। ফলে বিটিসিএল একটি কার্যকর কোম্পানি হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। বিটিসিএল কোম্পানির মত কার্যক্রম পরিচালনা করতে আরো অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

পরিচালনা বোর্ডের চ্যালেঞ্জ

বিটিসিএলের পরিচালনার জন্য টেলিযোগাযোগ ও ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন হলেও বোর্ডে মাত্র দুই জন টেলিযোগাযোগ বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। বাকিদের ৬ জনই সরকারি কর্মকর্তা ও তাদের টেলিকম বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। সরকারি কর্মকর্তার আধিক্য থাকায় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মতামতই প্রাধান্য পায়। আবার পরিচালকদের বোর্ডে থাকার সুনির্দিষ্ট সময় না থাকায় তারা মন্ত্রণালয় বা এফবিসিসিআই ও আইসিএবির চেয়ারম্যানের পদ থেকে চলে গেলে বিটিসিএলের বোর্ড থেকেও চলে যান। ফলে অনেকক্ষেত্রে এই পদে তারা খুব অল্প সময় থাকায় তাদের মধ্যে কোম্পানির প্রতি কোনো মালিকানাবোধ তৈরি হয় না। এছাড়া বোর্ড কোনো সিদ্ধান্ত নিলেও বাস্তবায়নের সময় আবার সরকারি নীতিই অনুসরণ করা হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে স্টাফদের যে পারফরমেন্স বোনাস দেওয়া হয়েছিল তা সিএজির অডিট আপত্তি দেওয়ার কারণে ফেরত দিতে হচ্ছে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) নিয়োগে জটিলতা

বিটিসিএলে এখনও কোম্পানির অর্গানোগ্রাম কার্যকর না হওয়ায় ২০০৯ সালে প্রজ্ঞাপণ অনুসারে চেয়ারম্যানকে আইনগতভাবে এমডি হিসেবে নিয়োগ প্রদান করার নিয়মটি কার্যকর করা যাচ্ছে না। বিটিটিবি থাকাকালীন সময়ে চেয়াম্যান ছিলেন একজন ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা এবং তার গ্রেড ছিল ২। ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিষয়গুলো মীমাংসা না করে তাকে বিটিসিএলে এমডি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে না। বিটিসিএলের কর্মকর্তাগণ টেলিকম ক্যাডারের বাইরে কোনো ব্যক্তিকে এই পদে নিয়োগের বিরোধিতা করায় দুই বার বিজ্ঞপ্তি দিলেও এখন পর্যন্ত কোনো নিয়মিত এমডি নিয়োগ হয়নি। যেসব ভারপ্রাপ্ত বা অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত এমডি নিয়োগ হচ্ছেন তারা এই পদে খুব অল্প সময় থাকেন এবং এমডির দায়িত্ব পালন করলেও কোম্পানির উন্নয়ন ও নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে পারেন না।

নতুন অর্গানোগ্রাম কার্যকর করার চ্যালেঞ্জ

বিটিসিএল ঘোষণার পরে মার্কেটিং, সেলস, কাস্টমার কেয়ার, আইটি ও বিলিং, কর্পোরেট সার্ভিস, বিজনেস রিলেসন, সিকিউরিটি ও লিগাল, এইচআরসহ নতুন নতুন বিভাগ সংযোজন করে একটি নতুন অর্গানোগ্রাম বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। এই অর্গানোগ্রাম অনুসারে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোম্পানিতে যোগ দিতে হলে তাদের মধ্যে চাকরির সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে কিছু অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এসব অনিশ্চয়তার কারণে কোম্পানির হয়ে কাজ করা বা না করার প্রশ্নে তাদের সামনে অপশন তুলে ধরা হলেও কর্মকর্তাগণ কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হচ্ছে না। এ অবস্থায় ক্যাডার কর্মকর্তাগণ তাদের সরকারি চাকরি বজায় রাখার জন্য আদালতে মামলা করলে আদালত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ এর মধ্যে তাদেরকে আত্তীকরণ করতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু এই রায়ের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয় আপিল করলে ২০১৩ সালের মার্চ পর্যন্ত রায় স্থগিত করা হয়। আদালতের রায় অনুযায়ী টেলিকম ক্যাডারের কর্মকর্তাদের আত্মীকরণের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় 'ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকম্যুনিকেশন' (ডট) গঠন করার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই ডট গঠনের জন্য জনপ্রশাসন, অর্থ এবং আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের মাধ্যমে সংসদ থেকে পাশ হতে হবে যা সময় সাপেক্ষ বিষয়। বর্তমানে এই ডট গঠনের প্রক্রিয়াটি আইন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও বাজেট শাখা থেকে অনুমোদনের পরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে রয়েছে। অন্যদিকে ডট গঠন হলেও কর্মকর্তাদের আত্তীকরণের জন্য লিয়েন ও প্রেষণের বিষয়ে প্রচলিত সরকারি নিয়মে কিছু জটিলতা রয়েছে। বিটিসিএলে পদায়নের জন্য প্রক্রিয়ধীন নতুন আইনে এই জটিলতা থেকে গেলে কর্মকর্তাগণ বিটিসিএলে কাজ করতে আগ্রহবোধ করবে না। আর 'ডট' গঠন ও নতুন আইন তৈরি করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদায়নের বিষয়গুলো যতদিন না সমাধান হচ্ছে ততদিন নতুন অর্গানোগ্রাম অনুসারে লোক নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে কোম্পানির মতো করেও কার্যক্রম শুরু করা যাচ্ছে না।

জনবল সম্পর্কিত সমস্যা

বিটিসিএলের কাঙ্খিত লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের অভাব। কোম্পানি হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সেলস, মার্কেটিং, প্রচারণাসহ নতুন প্রযুক্তি যেমন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ও এডিসিএল সেবা প্রদানের জন্য দক্ষ লোক নাই। আবার জেলা, উপজেলা, গ্রোথ সেন্টার পর্যন্ত 'ইউনিভার্সাল সার্ভিস' অবলিগেশনের আওতায় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। কিন্তু সেগুলো পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল নেই। বিশেষ করে সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী, ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী(ডিপ্লোমা) পদে কাজ করার মত প্রকৌশলীর অভাব প্রকট। বিটিটিবির সময়ে মঞ্জুরীকৃত পদ ছিল মোট ১৯,০৬৬টি কিন্তু বর্তমানে কর্মরত জনবল রয়েছে ৭৮০৮(৪১%) জন যা বিটিসিএলের নতুন অর্গানোগ্রামের পদের (৮৭০৩) তুলনায় কম। অন্যদিকে বিটিসিএলে পুরানো কিছু সেবা যেমন টেলিপ্রিন্টার, কল অপারেটর, টেকনিশিয়ান ও টেলিকম মেকানিক পদগুলো বন্ধ হলেও এই পদে লোক কর্মরত রয়েছে। ক্যাজুয়াল শ্রমিকদেরও অনেকেই আধুনিক প্রযুক্তির সাথে খাপ খাওয়াতে না পারলেও তারা চাকরি স্থায়ী করার জন্য বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন করে যাচ্ছে।

আকর্ষণীয় বিপণন কৌশলের অভাব

কোম্পানি হিসেবে বিটিসিএলকে প্রতিযোগীতায় টিকতে হলে এর পণ্যের প্রসার ঘটাতে আকর্ষণীয় প্রচারণা প্রয়োজন। কিন্তু বাজেট স্বল্পতার কারণে তা করা সম্ভব হচ্ছে না। বিটিসিএলের সেবার প্রচারণার জন্য কিছু বিজ্ঞাপন, লিফলেট ও ফেস্টুন তৈরি করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। ২০১০ সালে বিটিসিএলের ৫৯ সেকেন্ডের একটি বিজ্ঞাপন বিভিন্ন চ্যানেলে মাত্র ৩ মাসের জন্য প্রচারিত হয় যার মাধ্যমে মাত্র একটি সেবার চিত্র উঠে আসে। আবার কোম্পানি হিসেবে পরিচালনা বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত

হওয়ার কথা থাকলেও এই প্রচারণার জন্য সিএজি অফিসের আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছে। একজন কর্মকর্তার এ ধরনের আপত্তি মীমাংশা করাতে আড়াই বছর সময় লাগে। এই আপত্তির কারণে প্রচারণা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রচারণার কাজে আগ্রহ হারাচ্ছে।

নীতিমালা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিটিসিএলকে দুর্বল করা

১৯৯৮ সালে টেলিযোগাযোগ নীতিমালা পরিবর্তনের মাধ্যমে ২০০৭ সালের 'ইন্টারন্যাশনাল লং ডিসটেন্স টেলিকমিউনিকেশন্স সার্ভিসেস' পলিসি (আইএলডিটিএস)'র মাধ্যমে তিনটি কোম্পানিকে ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ের (আইজিডব্লিউ) লাইসেন্স প্রদান করা হয় এবং তারা বিটিআরসিকে টেরিফের ৫১.৭৫% দিতে রাজি হয়। বিটিআরসি এই তিনটি কোম্পানির সাথে সাথে আইজিডব্লিউর লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোম্পানি হিসেবে বিটিসিএলকেও এই টেরিফ ধার্য করে। পূর্বে বিটিটিবিকে এ ধরনের কোনো টেরিফ দিতে হত না এবং আন্তর্জাতিক কলের পুরো অংশই বিটিটিবি আয় করত। আবার বাংলাদেশের কল ভলিউমের উপর নির্ভর করে বিটিআরসি আর মাত্র ৪টি কোম্পানিকে আইজিডব্লিউর লাইসেন্স প্রদান করার সুপারিশ করলেও মন্ত্রণালয় তা অমান্য করে কিছু অসাধু রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থে ২০১২ সালের ডিসেম্বরে আরো ২৫টি কোম্পানিকে এই লাইসেন্স প্রদান করে যার মধ্যে কমপক্ষে ১০টির মালিক বর্তমান সরকার বা পূর্বের সরকারের সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীর আত্মীয়। এসব কোম্পানির বিটিআরসি, আসিএক্স ও এএনএসগুলোকে টেরিফের মোট ২.৬০২৫ সেন্ট প্রদান করতে হয়। বাকি অংশ থেকে সরঞ্জামাদি, জনবলের বেতন, বিপণন ইত্যাদির ব্যয় বাদ দিয়ে লাভ করতে হবে। এসব ব্যয় বাদে লাভজনক অবস্থানে যাওয়া কঠিন বলে তারা অবৈধ পথে কম দামে (সর্ব নিম্ন ১.৫ সেন্ট প্রতি মিনিট) কল আনছে যা বিটিআরসির পক্ষে তা মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে প্রতিদিন ৫৫ মিলিয়ন মিনিট আন্তর্জাতিক কল দেশে প্রবেশ করে যার মধ্যে ৩৬% কল অবৈধ পথে প্রবেশ করে থাকে। এসব কোম্পানির অবৈধ কলের কারণে বিটিসিএলের আন্তর্জাতিক কলের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দেখা যায় ২০১০ সালে বিটিসিএলের ইনকামিং কল ছিল প্রায় ৩৫৭ কোটি মিনিট যা ২০১৩ সালে এসে কমে গিয়ে দাড়ায় প্রায় ২০৯ কোটি মিনিটে। ফলে বিটিসিএলের আয় কমে যাচ্ছে।

বাজারে শেয়ার ছাড়ার চ্যালেঞ্জ

বিটিসিএল কোম্পানি হিসেবে ঘোষণার প্রায় ৬ বছর পার হলেও বাজরে এর শেয়ার ছাড়ার উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না। শেয়ার ছাড়ার যেসব শর্ত যেমন অডিট এবং ব্যালেন্স শীটে কমপক্ষে ৩ বছর লাভজনক অবস্থানে থাকা, কোম্পানির নিজস্ব জনবল থাকা ইত্যাদির কোনোটিই বিটিসিএলের নেই। এমতাবস্থায় আর্থিক সহায়তা দিয়ে বাজারে শেয়ার ছাড়লেও তা বিনিয়োগকারীদের নিকট আকর্ষণীয় না হতে পারে। অন্যদিকে বিটিসিএলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনিহার কারণেও বাজারে শেয়ার ছাড়া যাচ্ছে না। ফলে বিটিসিএলে মূলধনও বৃদ্ধি পাচ্ছে না পরিচালনা পর্ষদেও কোনো পরিবর্তন আসছে না।

বিরাজমান অন্যান্য চ্যালেঞ্জ

প্রকল্প অনুমোদনে বিটিটিবির সময়ের তুলনায় সময় কম লাগলেও প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্বের মতোই পিপিআর অনুসরণ করায় বেশির ভাগ প্রকল্পেরই সময়মত কার্যক্রম শুরু ও শেষ হয় না। ফলে সময় উপযোগী সেবা না দিতে পারায় গ্রাহক সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এতে রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বিটিসিএল। আবার মোবাইল সেবা দানের জন্য বিটিটিবি টেলিটক প্রকল্প এবং টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের সাথে যোগসূত্র করার জন্য সাবমেরিন কেবল প্রকল্পটিও সম্পন্ন করে। কিন্তু এই দুটি প্রকল্পকে আলাদা কোম্পানি করায় এর থেকে যে আয় হচ্ছে তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বিটিসিএল। অথচ এর ঋণের বোঝা বহন করতে হচ্ছে বিটিসিএলকেই। অন্যদিকে লাভজনক না হওয়া সত্ত্বেও ডিজিটাল বাংলাদেশের অংশ হিসেবে গ্রামে-গঞ্জে ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিটিসিএলের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক ও এক্সচেঞ্জ বসানোর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে পার্বত্য এলাকায় ১৯টি এক্সচেঞ্জের কথা উল্লেখ করা যায় যেখানে এক্সচেঞ্জ প্রতি মাত্র ২-৪টি সংযোগ রয়েছে।

গ্রাহক সেবা প্রদানে সীমাবদ্ধতা

বিটিসিএল ব্যয়বহুল কপার ক্যাবলের মাধ্যমে টেলিফোন সেবা প্রদান করায় প্রায়ই কেবল চুরির কারণে গ্রাহকদের লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অন্যদিকে এক্সচেঞ্জের সংযোগ দেয়ার সক্ষমতা থাকলেও ক্যাবল সংকটের কারণে গ্রাহকদের সংযোগ পেতে দেরি হয়। এক্সচেঞ্জ থেকে যে সকল গ্রাহকের অবস্থান অনেক দূরে তাদের নিজেদের ক্যাবল কিনে দিতে হয়। এছাড়া বিভিন্ন সময় রাস্তা কাটার কারণেও কেবল কাটা পরায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় এবং বিচ্ছিন্ন লাইনের সংযোগ পেতেও দীর্ঘ সময় লাগে। আবার পুরোনো প্রযুক্তি হওয়ায় কোনো কোনো এক্সচেঞ্জ ব্যয় অনেক বেশি কিন্তু সে পরিমাণ আয় এক্সচেঞ্জগুলো থেকে আসে না এবং এর মাধ্যমে ভ্যালু

এ্যাডেট সার্ভিস যেমন শর্ট মেসেজ পাঠানো ইত্যাদি সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়াও বিলিং পদ্ধতি অটোমেটেড ও প্রিপেইড না হওয়া, ওয়ারলেস লোকাল লুপের মাধ্যমে সেবা প্রদান না করায় ডাটা ও ভয়েসসহ অনেক সেবা একই সাথে দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

বিটিসিএলের অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র

আন্তর্জাতিক শাখার দুর্নীতি –*বাংলাদেশে থেকে বিদেশী কোম্পানি সেজে রাজস্ব ফাঁকি*

বিটিসিএলের পলিসি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক কল আদান-প্রদানের জন্য বিদেশী ক্যারিয়ারগুলোর কাছ থেকে জামানত হিসেবে ইউএস ডলারে মূল্য পরিশোধের ব্যাংক গ্যারান্টি নেওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী ব্যক্তি, টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং বিটিসিএলের আন্তর্জাতিক শাখার অসাধু কিছু কর্মকর্তার যোগসাজসে কিছু ব্যবসায়ী বিদেশী কোম্পানি সেজে বাংলাদেশে বসে এই ব্যবসা পরিচালনা করে। তারা ইউএস ডলারে ব্যাংক গ্যারান্টি না দিয়ে স্থানীয় মুদ্রায় ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি দেয়। এসব কোম্পানি কিছু দিন ব্যবসা করে ব্যাংক গ্যারান্টির তুলনায় অনেক বেশি অংকের বিল জমা করে পরিশোধ না করে অফিস ফেলে চলে যায়। একই কোম্পানি নতুন নামে একই কাজের জন্য পুনরায় বিটিসিএলের নিকট থেকে কল অদান প্রদানের অনুমতি গ্রহণ করে। বিটিসিএলের আন্তর্জাতিক শাখা বিষয়গুলো জানা সত্ত্বেও অবৈধ অর্থ গ্রহণ করে পূনরায় তাদের কাজ দেয়। আন্তর্জাতিক কল আদান প্রদানের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের কাছে বিটিসিএলে বর্তমানে পাওনা রয়েছে প্রায় ৯৬৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে যা প্রায় আদায়যোগ্য নয়।

আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জের দুর্নীতি –*আন্তর্জাতিক কলের রেকর্ড টেম্পারিংয়ের মাধ্যমে রাজস্ব আত্মসাৎ*

বিটিসিএলের আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জের কর্মকর্তাদের যোগসাজসে কারিগরি ক্রটির অভিযোগ দেখিয়ে ফোন কলের রেকর্ড টেম্পারিং করা হয়। ২০১১ সাল থেকে ২০১২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এই আন্তর্জাতিক কলের রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে না। এই সময়ে বিটিসিএলের এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে দিনে কত মিনিট বৈদেশিক কল আদান প্রদান হয়েছে, তার কোনো হিসাব নেই। কারণ হিসাব পাওয়ার যন্ত্র মহাখালী আইটিএক্স এর সিডিআর (কল ডিটেইল্ড রিপোর্ট) পাওয়া যাচ্ছে না। প্রায় ২ বছর ধরে সিডিআর নষ্ট বলে অভিযোগ তোলা হয়। প্রতিদিন গড়ে আন্তর্জাতিক কলের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৫০ লাখ মিনিটেরও বেশি সেখানে কল মুছে দেওয়ার কারণে কল কমে দাড়িয়েছে ১ কোটি ৭০ লাখ মিনিট। মূখ্য তথ্যদাতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে কল রেকর্ড টেম্পারিং এবং অন্যান্য আইসিএক্স ও মোবাইল কোম্পানিগুলোর পাওনা বাবদ বিটিসিএল প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা রাজস্ব ও ক্ষতির সম্মূখীন হয়েছে। কল টেম্পারিংয়ের জন্য দুদক বিটিসিএলের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ৭০০ কোটি টাকা আত্মসাতের ৪টি মামলা দায়ের করে।

অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসা

অবৈধ ভিওআইপি বন্ধ করার জন্য সরকার অনেক ধরনের পদক্ষেপ নিলেও বিটিসিএলের কর্মকর্তাদের যোগসাজসে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নির্বিঘ্নে এই ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারছে। বিটিসিএলে ডিপ প্যাকেট ইন্সপেকশন (ডিপিআই) স্থাপনের মাধ্যমেই এই অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করা সম্ভব হলেও বিটিসিএল তা করেনি। টিডিএম প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যান্ডউইথ সেবা প্রদানের কারণে বিটিসিএলের ব্যান্ডউইথের সঠিক পরিমাণ বলা সম্ভব নয়। ফলে অবৈধ পথে কতখানি ব্যান্ডউইথ ব্যবহৃত হচ্ছে তা ধরা কঠিন। এভাবে বিটিসিএলের গেটওয়ে এবং অবকাঠামো অবৈধ পথে ব্যবহার করে অবৈধ ভিওআইপি করার সুযোগ দেওয়ায় অসাধু কর্মকর্তারা আর্থিক ভাবে লাভবান হলেও বিটিসিএল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অন্যদিকে ভিওআইপি একটি প্রযুক্তি এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে এই ব্যবসা পরিচালনা করায় বিটিআরসির মনিটরিং প্রযুক্তিকে পাশ কাটিয়ে *’টানেলিং’* করে অবৈধভাবে কল টার্মিনেশন করায় বিটিআরসির ‘সিম ডিটেকশন বক্সে’ অবৈধ কলের হিসাব জমা পড়ছে না। বর্তমানে অবৈধ ভিওআইপির জন্য বিটিসিএল ছাড়া আরো ৩৮টি আইআইজি কোম্পানির গেটওয়ে ব্যবহার হচ্ছে যার হিসাব বিটিআরসি রাখতে পারছে না।

অবৈধভাবে কোম্পানির ভূমি দখল

সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিটিসিএল এর ভূমির পরিমান দ্বিতীয়। সারাদেশে বিটিসিএল’র ভূমি রয়েছে ১৮৪৩.২৯ একর। শুধু ঢাকাতেই রয়েছে ১৯৬.১৯ একর জমি। বিটিসিএলের এই ভূমি অনেক জায়গায়ই দখল হয়ে যাচ্ছে। কর্মকর্তাদের সহায়তায় কোম্পানির ভূমিগুলো এনওসি (No Objection Certificate) ও লীজ নিয়ে অবৈধ দখলদাররা দখল করে নিচ্ছে। এর মধ্যে কড়াইল, মতিঝিল, কক্সবাজারের কলাতলী, খুলনা ও কুমিল্লার লাকসামের জমি উল্লেখযোগ্য।

প্রশিক্ষণ এবং বদলি ও দায়িত্ব (দেখাশুনা) প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতি

বিটিসিএল কোম্পানি হিসেবে এর প্রশিক্ষণ ও বদলির কোনো নীতিমালা নাই। বিদেশে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কর্মকর্তারা দলীয় প্রেসার খাটিয়ে এবং লবিং করে নির্বাচিত হয়ে থাকে। কাজের সাথে সম্পর্কহীন বিষয়ে প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়। যেমন যিনি কেবল নিয়ে কাজ করছেন তাকে পাঠানো হচ্ছে সুইচিং বিষয়ের উপরের প্রশিক্ষণে। আবার চাকরির মেয়াদ খুব অল্প সময় পূর্বেও বিদেশে প্রশিক্ষণে পেরণ করা হয়।। ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞান তারা বিটিসিএলে কাজে লাগাতে পারে না।

অবৈধ অর্থ আয়ের সুযোগ সম্পন্ন পদে পদায়নের ক্ষেত্রে কর্মকর্তারা রাজনৈতিক প্রভাব ও ব্যক্তিগত লবিংয়ের মাধ্যমে পদায়ন নিয়ে থাকে। সদস্য ও পরিচালক - মেরামত ও সংরক্ষণ, বিভাগীয় প্রকৌশলী- আন্তর্জাতিক, বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী ও উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী-ফোনস্ বহি, পরিচালক - ইন্টারন্যাশনাল, বিভাগীয় প্রকৌশলী - ইন্টারনেট (ব্যান্ড উইথ বন্টন) এবং পরিচালক- প্রশাসন, বিভাগীয় প্রকৌশলী -বিল্ডিং এবং প্রকল্পের পদগুলোতে অবৈধ অর্থ আয়ের সুযোগ থাকায় এসব পদে সকলে পদায়ন পেতে চায় । অন্যদিকে ২৫তম বিসিএস এর পরে বিটিসিএলে ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগ বন্ধ থাকায় সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী, উপ বিভাগীয় প্রকৌশলীর অনেক পদ খালি রয়েছে। দুই তিন ধাপ উপরের এসব পদে অনেক উপ সহকারী প্রকৌশলী, মেকানিক ও টেকনিশিয়ানদের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেখাশুনা করতে দেওয়া হয়েছে। এই পদগুলোর মাধ্যমে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় হওয়ায় অর্থ আত্মসাতের সুযোগও এখানে বেশি। আর এসব পদে নিম্ন পদস্থ কর্মচারীরা কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদান এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পদায়ন নিয়ে থাকে।

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের অনিয়ম-দুর্নীতি

এ খাতে বাৎসরিক বাজেটের অর্থ বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়ের খরচ ছাড়াও সিবিএ নেতা ও মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ে অবৈধভাবে প্রদান করতে হয়। ১ কোটি টাকা বাজেট হলে সিবিএকে দিতে হয় প্রায় ৭ লাখ টাকা এবং টাকার হিসাব ডিইকে মাসিক খরচের বিভিন্ন ভুয়া ভাউচার দেখিয়ে বা অন্য কোনোভাবে মেলাতে হয়। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাও অবৈধভাবে কিছু টাকা আত্মসাৎ করে। মূখ্য তথ্যদাতার মতে, 'বরাদ্ধকৃত টাকার সর্বোচ্চ ৬০% সংশ্লিষ্ট খাতের কাজে ব্যয় হয় আর বাকিটা অবৈধ খরচ হয়'। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্রয়কৃত জিনিসের দাম বাজার দরের চেয়ে বেশি দেখানো হয়। যেমন ৮০০ টাকার কার্টিজ ৪০০০ টাকায় কেনার উদাহরণ উল্লেখযোগ্য।

পরিবহন খাতে দুর্নীতি

বিটিসিএলের গাড়ি মন্ত্রীসহ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তারাও ব্যবহার করে, যার ব্যয় দেখানো হয় বিটিসিএলে। প্রকল্পের গাড়ির ক্ষেত্রে নথিপত্রে গাড়ি ভাড়া ও জ্বালানী ব্যয় দেখিয়ে রেন্ট এ কারের যোগসাজসে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। এক্ষেত্রে গাড়ি প্রতি মাসিক ৫০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করা হয়। এসব গাড়ি কখনই প্রকল্পে আনা হয় না। অন্যদিকে বিভাগীয় প্রকৌশলীর অফিসগুলোতে গাড়ির ড্রাইভারদের মাসিক ১৬০ ঘন্টা থেকে ১৮০ ঘন্টা পর্যন্ত ওভারটাইম, এক মাস পর পর গাড়ি প্রতি ১৫ হাজার টাকা মেরামত ব্যয় এবং সিএনজি চালিত গাড়িগুলোতে প্রতিমাসে ৩০ লিটার তেল অতিরিক্ত প্রদান করতে বাধ্য করা হয়। গাড়ি মেরামত ও জ্বালানী বাবদ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ থাকায় পরিবহন শাখার লোকজন এই অর্থ প্রয়োজন না হলেও ভূয়া ভাউচার বানিয়ে ব্যয় দেখিয়ে আত্মসাৎ করে। এ ধরনের বিলে কর্মকর্তারা স্বাক্ষর করতে না চাইলে গাড়ি বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়।

সিবিএর হস্তক্ষেপ এবং অনৈতিক কার্যক্রম

বিটিসিএলে সিবিএর দৌরাত্ম এত বেশি যে, তারা যেকোনো দাবিতে কর্মকর্তাদের কার্যালয় ঘেরাও, দাবি মানতে নানা রকম হুমকি, টেবিল চাপরানো, মারধরসহ বিভিন্ন অশোভন আচরণ করে থাকে। তাদের সামনে অনেক ক্ষেত্রেই কর্মকর্তাগণ অসহায়। কন্ট্রাকটরদের ফাইল খুলে দেখা এবং তাদেরকে সিবিএ তহবিলে টাকা দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ, কোম্পানির খালি জায়গায় ঘর তুলে ভাড়া দেয়া, বাসা বরাদ্ধের জন্য চাঁদা আদায়, বিভাগীয় প্রকৌশলী অফিসের সিবিএ ইউনিটকে মাসিক ৩-৫ হাজার টাকা প্রদানে বাধ্য করা, সিবিএর অবৈধ কাজের জন্য প্রতিবাদ করলে মন্ত্রণালয়কে বলে বদলি করানোর মত দুর্নীতির সাথে সিবিএর লোকজন জড়িত।

অন্যান্য ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি

সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলীদের জন্য যে বাসা বরাদ্দ রয়েছে সে বাসাগুলোতে পরিচালক, বিভাগীয় প্রকৌশলী ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাগণ দখল করে আছে। এই বাসাগুলোর ভাড়া মাত্র ৩০০ টাকা হওয়ায় এসব কর্মকর্তাগণ তাদের জন্য বরাদ্দকৃত বাসায় বেশি ভাড়া দিয়ে থাকতে চায় না। অথচ তারা বিটিসিএল থেকে তাদের পদমর্যাদা অনুসারেই বাসা ভাড়া গ্রহণ করে থাকে। অন্যদিকে প্রাইভেট মোবাইল, আইজিডব্লিউ, আইআইজি কোম্পানিগুলো বিটিসিএলের কর্মকর্তাদের যোগসাজসে অবৈধভাবে বিটিসিএলের অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে লাভবান হচ্ছে। অবৈধভাবে সুবিধা প্রদান করার জন্য বিটিসিএলের খুলনা, সিলেট এবং পাবনা কার্যালয়ের তিনজন কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। আবার বিটিসিএলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন বেসরকারি টেলিযোগাযোগ কোম্পানিতে কর্মরত থেকে বিটিসিএলের সুবিধা বেসরকারি কোম্পানিকে পাইয়ে দিচ্ছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দীর্ঘ দিন ধরে কোম্পানি হিসেবে বিটিসিএল ঘোষণা হলেও সঠিক, কার্যকর ও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন না হওয়ায় বিটিসিএল কোম্পানির মত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে না। আবার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়ায় নতুন অর্গানোগ্রাম অকার্যকর এবং প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবলের অভাব দেখা দেয়। টেলিযোগাযোগ নীতিমালা রাজনৈতিক নেতা ও প্রাইভেট কোম্পানির স্বার্থে অপপ্রয়োগের ফলে বিটিসিএলের রাজস্বের উপরে এর নেতিবাচক প্রভাব পরছে। মন্ত্রণালয়-নির্ভর পরিচালনা বোর্ড হওয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া দীর্ঘ এবং সরকারি নিয়ম অনুসারে কার্যক্রম পরিচালনার ফলে যুগোপযোগী প্রযুক্তির সেবা প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছে বিটিসিএল। উপরের জটিলতা এবং অভ্যন্তরীণ প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান থাকায় গ্রাহক হয়রানি করা ও রাজস্ব হারিয়ে অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে বিটিসিএল।

সুপারিশঃ

আগামী ৬ মাসের মধ্যে বিটিসিএলকে সম্পূর্ণ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ন্যায় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে। এই সুপারিশটি কার্যকর করা ও উপরের সমস্যাসমূহ দূর করার জন্য টিআইবি বিটিসিএলের প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কারের জন্য আরো কিছু সুপারিশ প্রদান করছে।

১. পরিচালনা বোর্ডে মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ কমাতে হবে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী ভিত্তিতে বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করতে হবে এবং পরিচালনা বোর্ড টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা ও প্রশাসন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠন করতে হবে;
২. বিটিসিএল, টেলিটক এবং বিএসসিসিএল (সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লি.) -এই তিনটি কোম্পানিকে একত্রীভূত করে একটি কোম্পানিতে রূপান্তর করতে হবে;
৩. যত দ্রুত সম্ভব বাজারে শেয়ার ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে;
৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে;
৫. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা ও পদায়নের জটিলতা দূর করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
৬. নিয়োগের নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করে দ্রুত নতুন অর্গানোগ্রাম অনুসারে লোকবল নিয়োগ করতে হবে;
৭. বিটিসিএলের নিজস্ব ক্রয় নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে;
৮. আইজিডব্লিউ অপারেটরদেরকে অভিন্ন প্লাটফরমের নিয়ন্ত্রণে ব্যবসা পরিচালনা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
৯. সরকার পরিচালনায় অপরিহার্য টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য বিটিসিএলের একটি আলাদা ইউনিট গঠন করতে হবে যার কার্যক্রম মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে না হয়ে, সেবামূলক উদ্দেশ্যে হবে;
১০. রাজস্ব বৃদ্ধির বাস্তবমুখী টার্গেট গ্রহণ করে সে সম্পর্কে কোম্পানির প্রতিটি স্তরের কর্মীদের মধ্যে প্রণোদনা তৈরি করতে হবে;
১১. ট্রেড ইউনিয়নকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করে শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে;
১২. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে আধুনিকায়ন করার পাশাপাশি 'গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করতে হবে;
১৩. বিটিসিএলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং প্রতি বছরে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদের হিসাব ও বিবরণ প্রকাশ করতে হবে;
১৪. নিরীক্ষার পরে চিহ্নিত অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
১৫. গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যাপক প্রচরণা ও কাস্টমার সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিটিসিএল: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

১. ভূমিকা

দক্ষ ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রতিনিয়ত নতুন নতুন তথ্যের আদান-প্রদান জরুরি। টেলিযোগাযোগ হচ্ছে তথ্য বিনিময়ের সেই নির্ভরশীল মাধ্যম। টেলিযোগাযোগ খাত থেকে ২০১১ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ সালে সরকারের আয় হয়েছে প্রায় ১৮ হাজার ৪৮৭ কোটি টাকা।[১] সরকারি ও বেসরকারি উভয় টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেই এই আয় করা হয়। সরকারি টেলিযোগাযোগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) প্রধান গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। পূর্বে বিটিসিএল বিটিটিবি নামে সম্পূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হত। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিটিটিবি সম্পূর্ণ লাভজনক প্রতিষ্ঠান ছিল। পরবর্তীতে টেলিযোগাযোগ খাতকে বেসরকারি পর্যায়ে বিস্তার করার ফলে বিটিটিবির আয়ে কিছুটা কমতি দেখা দেয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলা এবং বিটিটিবিকে আরো লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য ১ জুলাই ২০০৮ তারিখে বিটিটিবিকে পাবলিক কোম্পানি বিটিসিএল করা হয়। টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর দ্রুত বিস্তার ঘটিয়ে এই খাতে নেতৃত্বকারী অবস্থানে থাকা হচ্ছে বিটিসিএল এর মূল লক্ষ্য। গ্রাহক সেবা উন্নত করা, গ্রাহক চাহিদা পূরণে অবকাঠামোর উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিক বিপণন নীতি গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন, রাজস্ব বৃদ্ধি এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সমৃদ্ধকরণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই প্রতিষ্ঠান যাত্রা শুরু করে।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে বিটিসিএল যাত্রার পরে ৫ বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হলেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে কোম্পানিটি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে সফল হতে পারেনি। বিটিটিবির সময়কার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও দুর্নীতির চিত্র এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পরিবর্তন করে এটিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে রূপান্তরিত করার সময়ে বিটিসিএলে কি কি সমস্যা বিরাজ করছিল তা গত ২৩ মার্চ, ২০১০ তারিখে প্রকাশিত "সরকারি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় সুশাসনের সমস্যা এবং উত্তরণের উপায়" শিরোনামে টিআইবির এক গবেষণায় উঠে এসেছে। এই গবেষণায় বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে (২০০৭-২০০৮) দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও টাস্কফোর্সের হস্তক্ষেপের কারণে বিটিসিএলে দুর্নীতি কিছুটা কমেছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক সরকারের সময়ে এসে বিটিসিএলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনিয়ম-দুর্নীতি আবার নতুন উদ্যমে শুরু হয়। বর্তমান রাজনৈতিক সরকারের ছত্রছায়ায় এবং যোগসাজশে অবৈধ ভিওআইপি পরিচালনা[২], দেশি কোম্পানিকে বিদেশী ক্যারিয়ার হিসেবে লাইসেন্স প্রদান, ডলারে ব্যাংক গ্যারান্টির পরিবর্তে দেশি ব্যাংকের গ্যারাটি গ্রহণ[৩], সিবিএর প্রভাব, পরিবহন পুলের দুর্নীতি, গ্রাহক হয়রানিসহ[৪] বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি নতুন উদ্যমে শুরু হয়েছে। এছাড়াও বিটিসিএলকে মুনাফাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার যে লক্ষ্য নিয়ে এর কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরির স্থায়িত্ব সংক্রান্ত সমস্যাসহ নানাবিধ কারণে তা ব্যাহত হচ্ছে। বিটিসিএলের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৯ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত পর পর তিন বছর ধরে বিটিসিএল লাভজনক অবস্থানে নেই। ২০০৯-২০১০ সালে ১,০২২,২৯৫৫২০ টাকা, ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ৩৩৫১৮৬৮৭৬২ টাকা এবং ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ১৭২০৮৪৩৩৮ টাকা ঘাটতিতে রয়েছে।[৫] বিটিটিবি থেকে কোম্পানি হিসেবে রূপান্তরের পর বিটিসএল যেখানে আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন করে মানুষের মাঝে সেবা দেওয়ার মাধ্যমে ক্রমশঃ একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবার কথা সেখানে বিটিসিএলের রাজস্ব আয়[৬] ও গ্রাহক সংখ্যা[৭] বৃদ্ধি না পেয়ে বরং কমে যাচ্ছে। এত বৃহৎ অবকাঠামো ও জনবল থাকা স্বত্ত্বেও বিটিসিএল একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনায় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা চিহ্নিতকরণ ও এ সকল সমস্যা দূরীকরণে সুপারিশ প্রদান করার লক্ষ্যে টিআইবি পূর্বের গবেষণার ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান অবস্থার উপরে একটি কার্যপত্র প্রণয়ন করছে।

---

[১] বিটিআরসি, ২২ জানুয়ারি ২০১৪।

[২] দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ মার্চ ২০১১, অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে অবৈধ ভিওআইপি, নেমে এসেছে বৈধ কল।

[৩] নয়া দিগন্ত, ২৭ জানুয়ারি ২০১২, ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়ে ভিওআইপি ব্যবসা।

[৪] কালের কণ্ঠ, ২৭ ডিসেম্বর ২০১২, বিটিসিএল এ গ্রাহকদের বিল হঠাৎ করে দ্বিগুণ।

[৫] বিটিসিএলের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৯-১০, ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২।

[৬] বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট ০১ এ বিটিটিবি ও বিটিসিএলের রাজস্বের চিত্র দেখুন।

[৭] বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট ০২ এ বিটিটিবি ও বিটিসিএলের গ্রাহকের চিত্র দেখুন।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বিটিসিএলের কার্যকর পরিচালনায় সুশাসনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১. বিটিসিএলের বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করা;
২. বিটিসিএলে বিরাজমান বর্তমান দুর্নীতির ধরণসমূহ চিহ্নিত করা; এবং
৩. বিরাজমান সীমাবদ্ধতা দূরকরণ এবং অনিয়ম দুর্নীতি প্রতিরোধে সুপারিশ প্রদান করা।

এই কার্যপত্রটি গুণবাচক তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে। এতে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ উৎসের মধ্যে রয়েছেন বিটিসিএল, সিএজি ও দুদক এর কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিটিসিএলের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যসহ অন্যান্য মুখ্য তথ্যদাতা। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ওয়েবসাইট, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর ও প্রবন্ধ। এপ্রিল ২০১২ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ করা হয়। উল্লেখ্য যে এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য সমানভাবে প্রযোয্য নয়।

৩. টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত পূর্বের গবেষণার উল্লেখযোগ্য তথ্য:

টিআইবি ইতিপূর্বে ২০১০ সালে যে গবেষণা করেছিল সেখানেও বিটিটিবি ও বিটিসিএলের বিভিন্ন রকম সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জ ও অনিয়ম-দুর্নীতির চিত্র উঠে আসে। তার মধ্যে তখনকার বিটিটিবি ও বিটিসএলের উপরে মন্ত্রণালয়ের প্রভাব, জবাবদিহিতায় পরিবর্তন না আসা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা, দক্ষ জনবলের অভাব, বিটিসিএলের নতুন অর্গানোগ্রাম কার্যকর না হওয়া, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরির অনিশ্চয়তা, জনবলের অভাব, বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধায় পরিবর্তন না আসা, নতুন অর্গানোগ্রাম কার্যকর ও জনবলের বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ, মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা, গ্রাহক সংখ্যা ও রাজস্ব বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হওয়া, শেয়ার বাজারে ছাড়ার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, পুরোনো যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কপার ক্যাবলের মাধ্যমে সেবা প্রদান, ক্যাবল চুরি হওয়া ও কাটা পড়ায় সেবা প্রদানে বিঘ্নতা, ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্টগুলো অরক্ষিত থাকা, সেবা বিষয়ে কোনো প্রচারণা না হওয়া এবং কাস্টমার কেয়ার ডেস্ক না থাকার মত সীমাবদ্ধতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার অর্থ শাখার ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিলিং, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ ম্যানুয়ালি করা হত। ফলে প্রায়ই আন্তর্জাতিক কলের ক্ষেত্রে ক্যারিয়ারগুলোর সাথে বিলের একটি বড় পার্থক্য পরিলক্ষিত হত যা আদায় করা কঠিন হয়ে পড়ত। অন্যদিকে অনেক অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্যও উঠে আসে। এর মধ্যে রয়েছে টেলিফোন সংযোগ নিতে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান, বিল প্রদানে হয়রানি, পুনঃসংযোগ নিতে অর্থ প্রদান, অবৈধ ভিওআইপির মাধ্যমে দুর্নীতি, মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিটিসিএলের গাড়ি ব্যবহার এবং তার ব্যয় বিটিসিএলের বহন করা, গাড়ি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ অতিরিক্ত অর্থ আদায়, ভুয়া বিল দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, বাজেট অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ এবং সিবিএ ও লাইনম্যান কর্তৃক অনিয়ম দুর্নীতি ইত্যাদি।

৪. বিটিটিবি থেকে বিটিসিএলে রূপান্তর

বিশ্বব্যাংকের সুপারিশ অনুযায়ী বিটিটিবিকে কোম্পানি করার প্রক্রিয়া শুরু হয় ২০০০ সাল থেকে। প্রস্তুতি ২০০০ সাল থেকে হলেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে ২০০৮ সালের পূর্বে তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে ৩০ জুন ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি 'বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড (সংশোধিত) অধ্যাদেশ', ২০০৮ জারি করেন। এছাড়া এটি একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হওয়ায় কোম্পানি আইনের (কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৯৪) অধীনে একটি 'মেমোরান্ডাম অব এসোসিয়েশন' প্রণয়ন করা হয়। তবে অধ্যাদেশে এ কথাও উল্লেখ করা হয় যে বিটিসিএলের জন্য দেশে প্রচলিত টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত আইন ও নীতিসমূহ সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। এছাড়া এই অধ্যাদেশে ১৯৭৯ সালের বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড অর্ডিন্যান্স এর সেকশন ৫ এর সঙ্গে দুটি নতুন সেকশন যথাক্রমে ৫এ এবং ৫বি সন্নিবেশ করা হয়। এখানে ৫এ সেকশনে মূলত বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ব্যবসা, প্রকল্প, স্কিম, সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, লাইসেন্স, দায় ইত্যাদি

একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করার কথা বলা হয়। তবে বোর্ডের কমকর্তা-কর্মচারীরা কোম্পানিতে যাওয়ার পর তারা বোর্ড বিলুপ্ত হওয়ার ২৪ মাসের মধ্যে কোম্পানি ত্যাগ করতে পারবে না। ৫বি সেকশনে সাবমেরিন কেবল সংক্রান্ত বোর্ডের আন্ডারটেকিংও একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করার কথা বলা হয়।

বিটিসিএলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিটিসিএলের লক্ষ্য হলো আধুনিক প্রযুক্তির টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে নেতৃস্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা। সর্বনিম্ন মূল্যে সার্বজনীন ও যুগোপযোগী টেলিযোগাযোগ সেবাদান নিশ্চিত করা। নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর জনবল কাজ করবে। বিটিসিএলের উদ্দেশ্য হলো বর্তমান অবকাঠামোর সাথে নতুন প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে আধুনিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা বজায় রেখে বিটিসিএলকে কার্যকর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

বিটিসিএলের সম্পদ

বিটিটিবি'র সকল সম্পদকে ১৫,০০০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন ধরে বিটিসিএল যাত্রা শুরু করে।[৮] জার্মান-ভিত্তিক টেলিকম কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান 'ডেটাকন ইন্টারন্যাশনাল' ৩ জুলাই ২০০৮ পর্যন্ত বিটিসিএলের সম্পদের হিসাব করে দেখায় যে, প্রতিষ্ঠানটির চলতি সম্পদের মূল্য ৬ হাজার ৬০৭ কোটি টাকা এবং দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ ৬ হাজার ৫৯ কোটি টাকা। অন্যদিকে চলতি দায় ছিল ২ হাজার ১১৭ কোটি টাকা, সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি দেনা রয়েছে আরো ১৪ হাজার কোটি টাকা। তবে এই হিসাবে 'বিক্রয় অযোগ্য' জমির পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[৯]

জনবল

বিটিটিবিতে কর্মরত ১,১৭০ জন কর্মকর্তাসহ মোট ১২,৬৩৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিটিসিএলে স্থানান্তরিত করা হয়। সরকার কর্তৃক ১২,৬৩৬টি সুপারনিউমারারি পদ সৃষ্টি করে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সরকারি চাকরি নিশ্চিত করা হয়েছে। পরিচালনা বোর্ড নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তত দুই বছরের মধ্যে বিটিসিএল কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রতিষ্ঠান থেকে বাদ দিবে না। তবে এ সময়ের পরে তাদের বিকল্প বাছাইয়ের সুযোগ দেওয়া হবে। যোগ্য ব্যক্তিকে তার কাজের সম্মাননা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তবে অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীই পেনশনে চলে যাওয়ায় বর্তমানে বিটিসিএলে ৭৮০৮ জন লোক কর্মরত রয়েছে।

বেতন-ভাতা

বিটিসিএল একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হলেও এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন–ভাতা দুই বছর (জুন ২০১০) পর্যন্ত সরকারি নিয়মে দেওয়া হবে। কিন্তু কোম্পানি হিসেবে ঘোষণার ৫ বছরের বেশি হলেও এখনও বেতন ভাতাদি সরকারি নিয়মেই প্রদান করা হচ্ছে। পরিচালনা বোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করে একটি ইনসেনটিভ বোনাস প্রদান করে। কিন্তু এই বোনাসের উপরে সিএজি কর্তৃক অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়। তাদের মতে বিটিসিএল সম্পূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবেই পরিচালিত হচ্ছে এবং যেহেতু এটি কোম্পানির ন্যায় পরিচালিত হচ্ছে না সেহেতু তাদের এই বোনাস প্রদান করাও নিয়ম বহির্ভূত। সুতরাং এই অর্থ ফেরতযোগ্য। এ কারণে বিটিসিএল থেকে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী পেনশনে গেছেন তাদের সকলকেই এই বোনাসের অর্থ ফেরত দিতে হয়েছে। ক্রমাগতভাবে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ায় বিটিসিএলের আর্থিক অবস্থা ভেঙ্গে পরেছে এবং বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বিটিসিএলের ফিক্সড ডিপোজিটের অর্থ ভাঙ্গিয়ে প্রদান করা হচ্ছে।

পরিচালনা বোর্ড

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব বিটিসিএল পরিচালনা পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। রূপান্তরকালীন যিনি সর্বশেষ বিটিটিবি'র চেয়ারম্যান ছিলেন তিনিই বিটিসিএলের প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিযুক্ত হন। এছাড়া পরিচালনা পরিষদের অপর সাতজন সদস্য ছিলেন ১. যুগ্ম সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, ২. যুগ্ম সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, ৩. যুগ্ম সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ৪.

---

[৮] বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড, সংবাদ সম্মেলন, ৩০ জুন ২০০৮।

[৯] দৈনিক ইত্তেফাক, বিটিসিএল এর সম্পদের চেয়ে দায় বেশি ৪ হাজার ২৩৭ কোটি টাকা, ৭ জুলাই ২০০৮।

পরিচালক সিগন্যালস, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ৫. শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, ৬. প্রেসিডেন্ট, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস, এবং ৭. প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি। পরিচালনা বোর্ডের এই সদস্যদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন (শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) তার প্রাসঙ্গিক পেশাগত যোগ্যতার জন্য এই পদে এসেছেন। বাকি সবাই তাদের পদের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ যখন যিনি এই পদগুলোতে থাকবেন তিনিই বিটিসিএলের পরিচালনা বোর্ডের পরিচালক হবেন। এসব পদ থেকে তাঁরা যদি পদোন্নতি পান বা স্থানান্তরিত হন তবে তিনি আর এই বোর্ডে থাকতে পারবেন না। বোর্ড পরিচালকরা বৈঠক প্রতি আড়াই হাজার টাকা করে ভাতা পাবেন বলে ২৯ জুন ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের প্রথম অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে বর্তমানে এই ভাতা বৃদ্ধি করে ৫০০০ টাকা করা হয়েছে।

বিটিসিএলের রাজস্ব

বিটিসিএল ঘোষণার প্রথম তিন মাসে ১৬০ কোটি টাকা নিট লাভের প্রাথমিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। ২৯ জুন ২০০৮ তারিখে এর প্রথম পরিচালনা বোর্ডের সভায় তিন মাসের অন্তর্বর্তী বাজেট অনুমোদিত হয়। এ বাজেটে তিন মাসে ৩৯২ কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে ২৩২ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে বাজেটে উল্লেখ করা হয় । এছাড়া এই সভাতেই বিটিসিএলের রাজস্ব আদায়ের জন্য ৯২টি কার্যালয়ে রাজস্ব অফিস খোলার সিদ্ধান্ত হয়। একই সঙ্গে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের যুগ্ম স্বাক্ষরে দুটি ব্যাংক হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত হয়। বিটিসিএল হওয়ার পরে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ১,৬০০ কোটি টাকা। তার মধ্যে রাজস্ব আদায় হয় ২,০৮১ কোটি টাকা। এর মধ্যে ব্যয় হয় ৬৪১ কোটি টাকা এবং উদ্বৃত্ত থাকে ১,৪৪০ কোটি টাকা। বিটিসিএল'র কর্মকর্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে এ সময়ে আন্তর্জাতিক কলের অনেক বকেয়া রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয়েছে বলে বিটিসিএলের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। তবে ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে অডিট ফার্ম কর্তৃক এ্যাক্রুয়াল ভিত্তিতে যে হিসাব করা হয় তাতে রাজস্ব আদায় হয় যথাক্রমে ১২০৮.৫১, ১৩৮৬.৯১, ১৭০২.৯২ এবং ১০৫৬ কোটি টাকা এবং উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি রয়েছে যথাক্রমে -৬৭.৯১, ১৫০.৩৬, ২৬৮.২৭ এবং -৫৪৬ কোটি টাকা।

৫. বিটিসিএলের অর্জন

২০০৮ সালের জুন মাসে বিটিটিবি থেকে কোম্পানি হিসেবে বিটিসিএল হওয়ার পরে এখানে কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। এসব উদ্যোগের বেশির ভাগই টেলিফোন সেবার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে করা হয়। যার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল নতুন ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন ও পূর্বের এক্সচেঞ্জগুলো বৃদ্ধি করা। ডিজিটাল টেলিফোন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের আওতায় ঢাকা ও ঢাকার বাইরে ২টি জেলায় অপটিক্যাল নেটওয়ার্কের উন্নতির জন্য ৭২টি এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্রগ্রামের ৩টি জেলার ১৭টি উপজেলায় নতুন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন, ১৭৮ উপজেলা ও ৪৪টি গ্রোথ সেন্টারে ডিজিটাল টেলিফোন সংযোগের সক্ষমতা অর্জন এবং ৯৩টি উপজেলার ১০৮টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়। বিটিসিএলের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এই অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করার ফলে কপার কেবলের ব্যবহারের দৈর্ঘ্য কমে আসছে এবং সেবা উন্নত হচ্ছে। বিটিসিএল এর একটি নতুন সংযোজন হচ্ছে এডিসিএল ব্রডব্রান্ড ইন্টারনেট ব্যবস্থা। বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে প্রায় ৪৭,০০০ লাইন দেয়ার সক্ষমতা নিয়ে এই কার্যক্রম যাত্রা শুরু করে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নতুন ৩০০০ লাইন ক্ষমতাসম্পন্ন রেড টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেমে চালু করা

সারণি ১: নতুন ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপন ও নতুন টেলিফোন সংখ্যা

এক্সচেঞ্জের নাম	টেলিফোনের সংখ্যা
বারিধারা	১০,০০০
বসুন্ধরা হাউজিং	২০০০

হয়। সম্প্রতি যশোরকে যে ডিজিটাল জেলা ঘোষণা করা হয়েছে তা বিটিসিএলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। বিটিভির অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করার জন্য ২৯টি কি পয়েন্ট স্থাপন করা হয়। বিল প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) চালু করা হয়েছে যাতে বিলে বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করে সেভাবে পদক্ষেপ নিতে পারে। আন্তর্জাতিক কলের সঠিক বিলিং হিসাবের চিত্র দেখার জন্য ইন্টারনেট প্রোটোকল বেইজড ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ (আইসিএক্স) ও ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ) চালু করার প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন হচ্ছে। বিটিসিএলের সহায়তায় ১৫৫টি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা চালু করার জন্য অপটিকাল ফাইবার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয় যাতে ট্রাফিক পুলিশ রাস্তার যানজট সম্পর্কে অবগত হয়ে ব্যবস্থা নিতে পারে। বিটিসিএল এনবিআর—এর কানেক্টিভিটির কাজও সম্পন্ন করে।[১০]

উত্তরা	২০০০
রমনা	৫০০০
নীলক্ষেত	৫০০০
গোড়ান	৩০০০
শেরে বাংলানগর	৪০০০
জাপান গার্ডেন সিটি	৮০০
মধ্য ধানমন্ডি	১০৫৬
ক্যান্টনমেন্ট	১৫৩৬
মিরপুর	১৫০০
ঢাকা শহরে সংযোগের কাজ চলছে	১,৪৪,৫০০
উপজেলা ও অন্যান্য মফস্বল শহর	৫০০০

টেলিফোন সংযোগ ফ্রি করা এবং টেলিফোন ও ইন্টারনেট চার্জ কমানো

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিটিসিএল কর্তৃক ফ্রি টেলিফোন সংযোগ (নাম্বার ও ক্যাবল) দেয়া হচ্ছে। বিটিসিএল থেকে বিটিসিএলে ৩০ পয়সা/ মিনিট এবং বিটিসিএল থেকে অন্য অপারেটরে ৬৫ পয়সা/ মিনিট চালু হয়েছে। এছাড়াও এসিমেট্রিক ডিজিটাল সাবসক্রাইবার লাইন (এডিএসএল) এর চার্জ ১২৮ কিলোবাইট- ৩০০ টাকা করা হয়েছে। ডিজিটাল ডেটা নেটওয়ার্ক (ডিডিএন) এর চার্জও কমানো হয়েছে।

৬. বিরাজমান চ্যালেঞ্জ

বিটিসিএলের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ২০০৮ সালে কোম্পানি হিসেবে ঘোষণা হলেও এখনও পর্যন্ত বিটিসিএল কোম্পানির মত করে কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি। এই ব্যর্থতার মূল কারণ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ঘোষণার পূর্বে যে ধরনের সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সেই অনুযায়ী কোম্পানিতে উত্তরণ পয়োজন ছিল তা করা হয়নি। যদিও ২০০০ সাল থেকে কোম্পানি করার জন্য বিভিন্ন সময়ে একাধিক কমিটি গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু ঐসকল সুপারিশ বিটিসিএল হিসেবে ঘোষণার সময়ে বিবেচনায় আনা হয়নি। এসব সুপারিশের মধ্যে ২০০৫ সালের ২৮ দফার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যেখানে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে উল্লেখ ছিল এবং সংশ্লিষ্ট ১০টি[১১] পক্ষের সম্মতিও ছিল। বিটিটিবিকে কোম্পানি করার জন্য পূর্বের কোনো সুপারিশকেই বিবেচনায় না আনার কারণে বিভিন্নরকম জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে বিটিসিএল কোম্পানি হিসেবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে কোম্পানি হিসেবে ঘোষণার সময় এর সম্পদের মূল্য ধরা হয় মাত্র ১৫,০০০ কোটি টাকা যা পরবর্তীতে জার্মানভিত্তিক কোম্পানি ডেটাকনের মতে অনেক বেশি ছিল। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে কোনো একটি প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানি হিসেবে ঘোষণা করার পূর্বে এর যে মূলধন নিয়ে কোম্পানি নিবন্ধিত হবার প্রস্তাব করছে, টাকার অংকে তার পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে এবং সে অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ারে উক্ত মূলধন বিভাজন করতে হবে। বিটিসিএলের ক্ষেত্রে সম্পদের মূল্য সঠিকভাবে না করে একটি লামসাম হিসেবে ধরা হয়।

---

[১০] বিস্তারিত জানতে বিটিসিএলের ওয়েবসাইটে পাঁচ বছরে উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি প্রতিবেদন দেখুন

[১১] সচিব- এওপিটি, চেয়ারম্যান- বিটিটিবি, মহাসচিব-বিসিএস টেলিকম সমিতি, মহাসচিব - সিবিএ, মহাসচিব - বাটেশকপ, মহাসচিব-বাংলাদেশ টিএন্ডটি শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেল ইউনিয়ন, মহাসচিব-বাংলাদেশ টিএন্ডটি শ্রমিক কর্মচারী আদর্শ ফেডারেল ইউনিয়ন, মহাসচিব-বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ শ্রমিক কর্মচারী সংহতি পরিষদ, মহাসচিব- টিএন্ডটি বোর্ড ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এ্যাসোসিয়েশন ও মহাসচিব-বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ মাস্টার রোল শ্রমিক কর্মচারী দল

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন দ্বারা বিটিসিএল পরিচালিত হবে মেমোরান্ডাম অফ এ্যাসোসিয়েশনে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এই আইনে বিটিটিবির মত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করা হবে সে বিষয়ে কোথাও উল্লেখ নেই। এখানে যেসব ক্যাডার কর্মকর্তা রয়েছে তাদের পদায়ন, সুযোগ-সুবিধা ও তাদের ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা করা হয়নি। এছাড়া কোম্পানি হিসেবে ঘোষণার পূর্বে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পেনশনে গেলে কোন খাত থেকে তা পূরণ করা হবে তা নির্ধারণ না করা, প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কার কি কি করা হবে এবং কিভাবে করা হবে তা ঠিক না করা, বিটিসিএলের জন্য আলাদা আইনি কাঠামো নির্ধারণ না করা, টেলিফোন ও ইন্টারনেট সেবা সম্পর্কিত সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না হওয়া, বিপণন কৌশল কি হবে, কিভাবে হবে, কারা এর দায়িত্বে থাকবে তা নির্দিষ্ট না হওয়া, ব্যবস্থাপনা পরিচালনা নিয়োগের নিয়ম নির্ধারণ না করা, শেয়ার উন্মুক্ত করার বিষয়ে দিক নির্দেশনা না থাকা অর্থাৎ বাজারে শেয়ার ছাড়লে কত শতাংশ সরকারের হাতে থাকবে ও কত শতাংশ জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে তা নির্ধারিত না করেই কোম্পানি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ফলে বিটিসিএল এখনও বিটিটিবির মতোই সরকারি নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে। বিটিটিবি থেকে বিটিসিএলে রুপান্তরের সময়ে পরিচালনা বোর্ডে যে আটজন পরিচালক ছিলেন তাদের মধ্যে ৭ জনই এখন আর বোর্ডের পরিচালক নন। বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন সরকারি কর্মকর্তা পদাধিকার বলে পরিচালনা পরিষদের সদস্য হয়েছেন, পরে বদলি বা পদোন্নতি পেয়ে বোর্ড থেকে চলে গেছেন। ফলে কার্যকরভাবে বিটিসিএলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করার জন্যে অব্যাহতভাবে কাজ করার সুযোগ তারা পাননি। উপোরোক্ত সকল সমস্যাসমূহের সমাধান না হওয়ায় বিটিসিএল পুরোপুরিভাবে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হয়ে উঠতে পারছে না।

পরিকল্পনা পর্যায়ের সমস্যার কারণে বিটিসিএল কোম্পানির মত কার্যক্রম পরিচালনা করতে আরো অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মূখীন হচ্ছে যা বিটিসিএলকে কোম্পানির মত এবং একটি লাভজনক অবস্থানে পৌঁছাতে বাধার সৃষ্টি করছে। নিম্নে এসব চ্যালেঞ্জগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

৬.১ পরিচালনা বোর্ডের চ্যালেঞ্জ

টেলিযোগাযোগ খাতে ব্যবসা বিকাশের সাথে প্রকৌশল ও ব্যবস্থাপনার ওপর সমন্বিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় তাদের টেলিযোগাযোগ কোম্পানির পরিচালনা বোর্ডে টেলিকম, আইন ও ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ রয়েছে। তাদের টেলিকম, অর্থনীতি, ব্যবসা প্রশাসন, আইন ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের সাথে রয়েছে তাদের টেলিকম খাতে কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। ফলে কোম্পানিগুলো একদিকে যেমন কারিগরি বিষয়ে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন নতুন সেবা প্রদান করে জনগণের সন্তুষ্টি অর্জন করছে অন্যদিকে রাজস্ব বৃদ্ধি করছে। উল্লেখ্য, ভারতের পাবলিক লিমিটেড টেলিকম কোম্পানি ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল) এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিএসএনএলের পরিচালনা বোর্ডের দশজন সদস্যের মধ্যে চার জন টেলিকম বিশেষজ্ঞ এবং পাঁচ জন সরকারি কর্মকর্তা। কিন্তু এই সরকারি আমলাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে তাদের প্রত্যেকেরই টেলিকম বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। বাংলাদেশের বিটিসিএল'র পরিচালনা বোর্ডের নয়জন সদস্যের মধ্যে ছয় জন হলেন বিভিন্ন পদমর্যাদার সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে এসব কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক কাজের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকলেও টেলিকম বিষয়ে প্রযুক্তি ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। পূর্বের গবেষণায়ও একই ধরনের তথ্য পাওয়া যায় এবং এ বিষয়ে টিআইবি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ ছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো পরিবর্তন হয়নি। বিটিটিবির সময়েও একই কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম পরিচালিত হত। সরকারি কর্মকর্তাদের আধিক্য থাকায় বোর্ডের সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের মতামতেরই প্রাধান্য থাকে।

আবার বোর্ডের সদস্যদের বোর্ডে থাকার নির্দিষ্ট কোনো সময় নির্ধারিত নেই। তারা মন্ত্রণালয় পরিবর্তন কিংবা অন্যান্য পদগুলো যেমন এফবিসিসিআই[১২], আইসিএবি[১৩] এর চেয়ারম্যান হিসেবে যখনই দায়িত্ব থেকে চলে যান তখন তারা বোর্ড থেকেও চলে যান। ফলে এই পদে তারা দীর্ঘ সময় না থাকায় তাদের মধ্যে কোম্পানির প্রতি কোনো মালিকানাবোধ তৈরি হয় না। সভাগুলোতে তাদের অনেক ব্যস্ততা দৃশ্যমান হয় এবং দ্রুত সভা শেষ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু তারা নিজেদের কাজের বাইরে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন

[১২] ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ।
[১৩] ইনস্টিটিউশন অফ চার্টার্ড একাউন্টস অফ বাংলাদেশ।

করেন তাদের এই কোম্পানির প্রতি খুব বেশি সময় ব্যয় করার সুযোগ থাকে না। যারা সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে রয়েছেন এই কোম্পানিতে কাজ করার জন্য তাদের পারফরমেন্সে কোনো প্রভাব পড়ে না। আবার দেখা যায় যে বিটিসিএলের পরিচালনা বোর্ড বড় কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলেও তা বাস্তবায়নের সময় আবার সরকারি নীতিই অনুসরণ করা হয়। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যে পারফরমেন্স বোনাস দেওয়া হয়েছিল তা সিএজির অডিট আপত্তি দেওয়ার কারণে ফেরত দিতে হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে বিটিসিএলে টেরিফ পরিবর্তন ছাড়া তাদের অন্য কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।

৬.২ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) নিয়োগে জটিলতা

বিটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের বিষয়ে ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রদানকৃত প্রজ্ঞাপন অনুসারে বিটিটিবির চেয়ারম্যান পদটি নবগঠিত বিটিসিএলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে গণ্য হবে।[১৪] বিটিসিএল কোম্পানি হিসেবে ঘোষণার সময়ে একজন চেয়ারম্যান ছিলেন এবং তাকে এই প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সহজেই স্থানান্তর করে এমডি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এরপরে বিটিসিএলে কাউকেই যেহেতু চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ হয়নি সেহতু কাউকেই নিয়মিত এমডি হিসেবেও স্থানান্তর করা যায়নি। এমডি হিসেবে যাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তারা সকলেই ভারপ্রাপ্ত বা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। নিয়মিত এমডি নিয়োগের জন্য দুইবার উন্মুক্ত বিজ্ঞাপন দেওয়া হলেও বিটিসিএলের কর্মকর্তাদের অনিহার কারণে কাউকেই নিয়োগ দেওয়া যায়নি। টেলিকম ক্যাডারের বাইরে কাউকে বিটিসিএলের এমডি হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার বিরোধী করছে তারা। সেপ্টেম্বর, ২০১১ এ একজন বাইরের ব্যক্তিকে এমডি হিসেবে মনোনীত করলেও এ আদেশ মাত্র ৩ ঘণ্টা বহাল ছিল। আবার যেহেতু বিটিসিএলে এখনও কোম্পানির অর্গানোগ্রাম কার্যকর হয়নি এবং ক্যাডার কর্মকর্তাদের সুযোগ সুবিধার বিষয়গুলো এখনও অমীমাংসিত, সেহেতু একজন ক্যাডার কর্মকর্তা হিসেবে তাকে এমডি হিসেবে নিয়োগ করা যাচ্ছে না। কারণ এমডির পদটি একটি অস্থায়ী পদ। আর চেয়ারম্যানের পদটি হচ্ছে একটি ক্যাডারভুক্ত পদ এবং তার গ্রেড হচ্ছে ২। বিটিসিএল ঘোষণার পরে এই গ্রেড ২ পদে পদোন্নতি না হওয়ায় নিম্ন পদস্থ কর্মকর্তাগণ তাদের পদোন্নতির সুযোগ হারাচ্ছে। যেসব ভারপ্রাপ্ত বা অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত এমডি নিয়োগ হচ্ছেন তারা খুব বেশি সময় পদে থাকতে পারছে না এবং তারা ভারপ্রাপ্ত বা অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ায় এমডির দায়িত্ব পালন করলেও কোম্পানির উন্নয়ন ও নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতা সীমিত। তারা কোম্পানির উন্নয়নে তেমন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করে না বরং শুধু প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। ফলে নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ছে বিটিসিএল।

৬.৩ নতুন অর্গানোগ্রাম কার্যকর করার চ্যালেঞ্জ

বিটিসিএল ঘোষণার পরে মার্কেটিং, সেলস, কাস্টমার কেয়ার, আইটি ও বিলিং, কর্পোরেট সার্ভিস, বিজনেস রিলেসন্স, সিকিউরিটি ও লিগ্যাল, এইচআরসহ নতুন নতুন বিভাগ সংযোজন করে একটি নতুন অর্গানোগ্রাম বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। কিন্তু এই অর্গানোগ্রাম অনুসারে সরকারি চাকরি থেকে কোম্পানিতে বেসরকারি চাকরিতে যোগ দিতে হলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কিছু অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এসব অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে-

- কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার চাকরি থাকবে, কার থাকবে না সে বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোম্পানিতে কিভাবে নেওয়া হবে, তারা কি চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোম্পানিতে যোগদান করবে নাকি বিটিসিএলের চাকরিরই অংশ হিসেবে কোম্পানিতে কাজ করবে;
- চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোম্পানিতে যোগদান করলে অবসরে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চাকরির নিশ্চয়তা দেওয়া হবে কিনা;
- এত দিন ধরে তারা যে সরকারি চাকরি করছিলেন তার জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবেন কিনা, কিভাবে পাবেন বা কি পরিমাণে পাবেন তার কোনো প্রস্তাবনা এখনও দেওয়া হয়নি;
- কেউ কোম্পানিতে কাজ না করতে চাইলে তাদের কোথায় নিয়োগ দেওয়া হবে;
- কোম্পানিতে আসার জন্য তাদের কোন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।

[১৪] ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, অধিশাখা -২ এর প্রজ্ঞাপন, স্মারক নং-পিটি/শাখা-২/১ই-৬/৯৭(অংশ)-২০০, ০৯ এপ্রিল ২০০৯

উপরের অনিশ্চয়তার কারণে কোম্পানির হয়ে কাজ করা বা না করার প্রশ্নে তাদের সামনে অপশন তুলে ধরা হলেও কর্মকর্তাগণ কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হচ্ছেন না। আর এ কারণেই তারা যতক্ষণ না তাদের সুবিধাদি নিশ্চিত না হবেন ততক্ষণ নতুন অর্গানোগ্রাম অনুসারে লোক নিয়োগ করতে দিচ্ছেন না।

নতুন অর্গানোগ্রামে বিপণন, ক্রয়-বিক্রয়, গ্রাহক সেবা, আইটি, অর্থ, মানবসম্পদ, প্রশাসনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদা পদ তৈরী করা হয়েছে। সেখানে প্রতিটি পদের জন্য সুনির্দিষ্ট জব ডেসক্রিপশনও রয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত নতুন অর্গানোগ্রাম কার্যকর না হওয়ায় এসব বিভাগে লোক নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। গুরুত্বপূর্ণ পদের অনেক কর্মকর্তাকে একাধিক কাজের দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। ফলে তাদের পক্ষে মানসম্মত সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

নতুন অর্গানোগ্রাম কার্যকর না হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনীহা। ২০০৯ সালে সংশোধিত 'টেলিগ্রাফ এন্ড টেলিফোন বোর্ড অর্ডিনেন্স ১৯৭৯' অনুসারে ২০১০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বিটিসিএলে কাজ করবে বলে উল্লেখ করা হয়। এই সময়ের পরে তাদেরকে অপশন দেওয়া হবে তারা কোম্পানিতে কাজ করবে কি না। কিন্তু এই সময়সীমা শেষ হলেও ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে কোনো নীতিমালা বা প্রজ্ঞাপণ জারি করা হয়নি। কেবল 'অপশন' সংবলিত আবেদন পত্র বিলি করা হয়েছে কিন্তু এর কোনো বাস্তবায়ন নেই। ফলে অনিশ্চয়তা নিয়ে ২০১০ সালের জুলাই মাস থেকে সবাই কাজ করছে। নতুন নিয়োগ না হওয়ায় আরো একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে কিছু কর্মকর্তার পদমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার মর্মে উচ্চ আদালতে রিট আবেদন করা। সরকারি সুবিধায় চাকরি বজায় রাখার জন্য কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ আদালতে গিয়েছিলেন। আদালতের রায় অনুযায়ী, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ এর মধ্যে বিসিএস টেলিযোগাযোগ ক্যাডার কর্মকর্তাগণকে আত্মীকরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়।[১৫] কিন্তু এই রায়ের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয় আপিল করলে ২০১৩ সালের মার্চ পর্যন্ত রায় স্থগিত করা হয়। সে হিসেবে আদালতের রায় অনুসারে আত্মীকরণের স্থগিতাদেশের এক বছরের বেশি সময় পার হলেও আদালতের সে রায় কার্যকর করা হয়নি। আদালতের রায় অনুযায়ী টেলিকম ক্যাডারের কর্মকর্তাদের আত্মীকরণের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় 'ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশন্স' (ডট) গঠন করার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই ডট গঠনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের মাধ্যমে সংসদ থেকে পাশ হতে হবে যা সময় সাপেক্ষ বিষয়।[১৬] বর্তমানে এই ডট গঠনের প্রক্রিয়াটি আইন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও বাজেট শাখা থেকে অনুমোদনের পরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে রয়েছে।

ডটের অর্গানোগ্রামে দেখা যাচ্ছে মোট ২৩৮টি স্থায়ী পদ রাখা হয়েছে এবং ৭৫৩৬টি পর্যায়ক্রমে বিলোপযোগ্য পদ রয়েছে। এই বিলোপযোগ্য পদের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ইচ্ছে করলে লিয়েন বা প্রেষণে বিটিসিএলে কাজ করতে পারবে। তবে লিয়েন এবং প্রেষণের সরকারি যে নিয়ম রয়েছে তাতেও কর্মকর্তাদের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জটিলতা রয়েছে। যেসব কর্মকর্তার চাকরির বয়স ১০ থেকে ২৫ বছর তারা বিটিসিএলে প্রেষণে আসলে বিটিসিএলে ধার্যকৃত বেতন পাবে না, সরকারি নিয়মেই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন বেশি পাবে। আবার কোনো কর্মকর্তা যদি সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিটিসিএলে যোগদান করেন তাহলে তারা বিটিসিএলে নিয়মিত হিসেবে যোগদান করতে পারবে না তাদের চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দিতে হবে। কারণ প্রচলিত সরকারি নিয়ম অনুসারে একটি সরকারি চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরে অন্য একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত হিসেবে কাজ করা যায় না। এক্ষেত্রে যাদের আরো ৫-১০ বছর সরকারি চাকরির মেয়াদ আছে তারা বাকি সময়ের চাকরি ছেড়ে দিয়ে অনশ্চিয়তার ভিতরে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগে চাকরি করতে চাইবে না। অন্যদিকে লিয়েনে আসতে চাইলে তারা তাদের নিয়মিত পদোন্নতি হারাবে এবং পেনশন ও অন্যান্য সুবিধাদি ডটের যে পদ থেকে তারা বিটিসিএলে যোগদান করবে সেই পদ অনুসারেই পেনশন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাবে। এক্ষেত্রে তারা যদি ডটে আর কাজ না করে তাহলে তাদের পদোন্নতি বন্ধ থাকবে। কারণ পদোন্নতি পেতে হলে একটি নির্দিষ্ট সময় ফিডার পদে কাজ করতে হয়। অন্যদিকে যেসব কর্মকর্তার চাকরির মেয়াদ ১০ বছরের নীচে রয়েছে তারা যদি নিয়মিত হিসেবে বিটিসিএলে চাকরি করতে চায় তাহলে তারা ডটের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তা করতে পারবে। কারণ সরকারি নিয়ম অনুসারে তারা পেনশন পাওয়ার যোগ্য হয়নি। তবে এসব কর্মকর্তা আরো প্রায় ২০ থেকে ২৭ বছর পর্যন্ত সরকারি চাকরি করতে পারত। চাকরি ছেড়ে দিয়ে আসলে তারা যতদিন কাজ করেছে তার জন্য কোনো সুবিধা পাবে না।

[১৫] রিট পিটিশন নম্বর ১৩৮০ (২০০৯) এর প্রেক্ষিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের রায়ের দলিল, ১৯ অক্টোবর ২০১০ এ প্রকাশিত।
[১৬] ডট গঠনের ধাপ সম্পর্কে জানতে দেখুন পরিশিষ্ট ৩।

এসব জটিলতার বিষয়ে নতুন আইনে সিদ্ধান্ত না হলে ক্যাডার কর্মকর্তাগণ বিটিসিএলে এসে চাকরি করতে চাইবে না। নতুন আইন করার ক্ষেত্রে এসব জটিলতাকে বিবেচনায় নিয়ে আসতে হবে। তবে নতুন আইন তৈরির বিষয়টি এখনও প্রক্রিয়াধীন। আর ডট গঠন ও নতুন আইন তৈরি করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদায়নের বিষয়গুলো যতদিন না সমাধান হচ্ছে ততদিন নতুন অর্গানোগ্রাম অনুসারে লোক নিয়োগ করা সম্ভব নয়। আর নতুন অর্গানোগ্রাম কার্যকর না হলে কোম্পানির মতো করেও কার্যক্রম শুরু করা যাচ্ছে না। এখানে পূর্বের বিটিটিবির মতই সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৬.৪ জনবল সম্পর্কিত সমস্যা

বিটিসিএলের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার অন্যতম প্রধান একটি বাধা হচ্ছে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের অভাব। কোম্পানি হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সেলস, মার্কেটিং, প্রচারণাসহ বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার জন্য এখানে দক্ষ লোক নাই। অন্য বিভাগের লোক দিয়ে কোনোরকমভাবে কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। সময়ের চাহিদানুযায়ী প্রতিনিয়ত প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ওপর এর সফলতা বহুলাংশে নির্ভরশীল। বিটিসিএলকে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে মোবাইল ফোন, পিএসটিএনসহ অন্যান্য প্রাইভেট কোম্পানির সাথে। প্রাইভেট কোম্পানিগুলো আয় বৃদ্ধির জন্য এবং বাজারকে ধরে রাখার জন্য প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবা প্রদান করছে। এই নতুন প্রযুক্তির যন্ত্রাদি চালনার জন্য তারা দক্ষ লোকবল নিয়োগ করছে। ফলে সাধারণ মানুষ এসব আধুনিক সেবার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে। অথচ দক্ষ জনবলের অভাবে বিটিসিএল মানুষের নতুন প্রযুক্তিগত চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। যেমন, বিটিসিএলে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ও এডিসিএল সেবা চালু হলেও তার সেবা সঠিকভাবে চালনার জন্য যোগ্য এবং দক্ষ প্রকৌশলীর অভাব রয়েছে। বিটিসিএল এর ওয়েবসাইটে অভিযোগ পাতায় দেখা গেছে প্রচুর গ্রাহক ইন্টারনেট সেবা নিতে চাইলেও সেখানে সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এসব সেবা প্রদানের জন্য নিজস্ব দক্ষ জনবল না থাকায় বিটিসিএলকে বাইরের জনবলের উপরে নির্ভর করতে হচ্ছে। প্রাইভেট কোম্পানির মাধ্যমে এই সেবা প্রদান করার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হলেও টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ভাল কোনো কোম্পানি পাওয়া যাচ্ছে না। যেসব কোম্পানি এ কাজ করার জন্য পাওয়া গেছে তারা তাদের মূল কাজ সেবা প্রদানের চেয়ে মডেম বিক্রির প্রতি বেশি আগ্রহী। আবার জেলা, উপজেলা, গ্রোথ সেন্টার পর্যন্ত 'ইউনিভার্সাল সার্ভিস' অবলিগেশনের আওতায় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। কিন্তু সেগুলো পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল নেই। বিশেষ করে সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী, ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী(ডিপ্লোমা) পদে কাজ করার মত প্রকৌশলীর অভাব প্রকট। কোথাও কোথাও দক্ষ না হওয়া সত্ত্বেও ড্রাইভারদের পদোন্নতি দিয়ে এসব পদে পদায়ন করা হয়েছে। বিটিটিবির সময়ে মঞ্জুরীকৃত পদ ছিল মোট ১৯,০৬৬টি কিন্তু বর্তমানে কর্মরত জনবল রয়েছে ৭৮০৮(৪১%) জন যা বিটিসিএলের নতুন অর্গানোগ্রামের পদের (৮৭০৩) তুলনায় কম। উপজেলা পর্যায়ে এক্সচেঞ্জ প্রতি ৭ জন লোক থাকা প্রয়োজন হলেও বর্তমানে কোনো কোনো এক্সচেঞ্জে মাত্র ১ থেকে ৩ জন লোক কাজ করছে। অনেকেরই চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে অবসর গ্রহণ করছে এবং জনবল ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে।

অন্যদিকে অপ্রয়োজনীয় লোকের আধিক্যও এখানে বিদ্যমান। সময়ের বিবর্তনে বিটিসিএলে নতুন নতুন সেবা চালু হয়েছে এবং পুরানো কিছু সেবা বন্ধ করা হয়েছে। বিটিটিবিতে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী পুরোনো সেবা যেমন টেলিপ্রিন্টার, কল অপারেটর, টেকনিশিয়ান ও টেলিকম মেকানিক পদে কাজ করছিল তাদের বর্তমানে কোনো কাজ নেই। এদের অনেকেই বর্তমান নতুন প্রযুক্তি যেমন ডিজিটাল টেলিফোন ও ইন্টারনেট সেবার সাথে খাপ খাওয়াতে পারছে না। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েও কাজ করানো সম্ভব হচ্ছে না। বিটিটিবি'র প্রতিটি স্তরেই কোনো কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, সময়নিষ্ঠা, সেবাদানের মানসিকতা ইত্যাদির যথেষ্ঠ অভাব ছিল যা বিটিটিবিকে অনেকটাই দুর্বল করে রেখেছিল। কর্মকর্তাদের মধ্যেও টেলিযোগাযোগ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞানের কমতি লক্ষ্য করা গেছে বলে পূর্বের গবেষণায় তথ্য পাওয়া যায়। আবার দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে এমন অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও বিচার না করে বিটিসিএলে বহাল রাখা হয়েছে। এভাবে পূর্বের অদক্ষ ও দুর্নীতিগ্রস্ত সকল কর্মীকে কোনো রূপ যাচাই-বাছাই না করে বিটিসিএলে আত্মীকরণ করা হয়। সুতরাং কোম্পানি হিসেবে যেভাবে বিটিসিএলের কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন তা করা সম্ভব হচ্ছে না।

আবার মাঠ পর্যায়ে গ্রাহক সেবা প্রদানে কাজ করে ক্যাজুয়াল শ্রমিকরা। সময়ের চাহিদানুযায়ী বিটিসিএলে গ্রাহক সেবায় প্রতিনিয়ত প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটছে। পরিবর্তিত প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাহক সেবায় সমস্যা দেখা দিলে মাঠ পর্যায়ে তা সমাধান করতে এই সকল

ক্যাজুয়াল শ্রমিকরা সক্ষম হচ্ছে না। কারণ এই সকল প্রযুক্তির সাথে তারা পরিচিত নয়। এদের কেউ কেউ ভাল কাজ জানলেও বেশিরভাগই পরিবর্তিত প্রযুক্তি গ্রহণের প্রেক্ষাপটে অদক্ষ। এমতাবস্থায় বিটিসিএলে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং স্থায়ী করাটা সময়ের পরিবর্তনে কতটুকু লাভজনক বা যৌক্তিক হবে তা প্রশ্নের সম্মুখীন। ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের স্থায়ীভাবে নিয়োগের বিষয়ে ২০ জুন ২০১১ বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে কোম্পানির প্রয়োজনে শূণ্যস্থানে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অনুযায়ী ওয়ার্কচার্জড্ কর্মচারীদের মাস্টার রোলের আওতায় আনা হবে। অর্থাৎ এখানে সকলকে মাস্টার রোলের আওতায় আনা হবে না এবং তাদের স্থায়ীও করা হচ্ছে না। কিন্তু বিটিসিএল এর ওয়ার্কচার্জড্ ও ক্যাজুয়াল (অস্থায়ী) কর্মচারীরা চাকরি স্থায়ীত্বের দাবিতে আন্দোলন করলে সকল ক্যাজুয়াল কর্মচারীদের ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে এক আদেশ বলে শীডভুক্ত করা হয়। তবে তাদের সকলকে কোম্পানিতে নেওয়া হবে কিনা তা এখনও অনিশ্চিত। বর্তমানে আন্দোলন বন্ধ থাকলেও নতুন অর্গানোগ্রাম কার্যকর হওয়ার সময়ে তাদের আত্মীকরণ না করলে আবারও আন্দোলনে নামার সম্ভাবনা রয়ে গেছে।

৬.৫ আকর্ষণীয় বিপণন কৌশলের অভাব

কোম্পানি হিসেবে বিটিসিএলকে প্রতিযোগীতায় টিকতে হলে এর পণ্যের প্রসার ঘটাতে হবে এবং তার জন্য আকর্ষণীয় প্রচারণা প্রয়োজন। বর্তমানে বিটিসিএলের সেবার প্রচারণার জন্য কিছু বিজ্ঞাপন, লিফলেট ও ফেস্টুন তৈরি করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। বাংলা নববর্ষ ১৪১৮ সালের ১ নভেম্বর শাহবাগে বিটিসিএলের ফোন এবং ইন্টারনেট সেবা ভিত্তিক মোবাইল বিলবোর্ড তৈরি ও প্রচার করা হয়। ২০১০ সালে বিটিসিএল'র ৫৯ সেকেন্ড এর একটি বিজ্ঞাপন বিভিন্ন চ্যানেলে মাত্র ৩ মাসের জন্য প্রচারিত হয়। যেখানে অন্যান্য কোম্পানি বহু দিন ধরে বিভিন্ন রকম সেবার ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞাপন প্রচার করে এবং নতুন নতুন সেবার তথ্য দ্রুততার সাথে গ্রাহকের নিকট পৌঁছে দেয় সেখানে বাজেট স্বল্পতার কারণে বিটিসিএল মাত্র তিন মাসের জন্য একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করে যার মাধ্যমে বিটিসিএল এর একটি সেবার চিত্র উঠে আসে। এখনও পর্যন্ত টেলিফোন ছাড়া বিটিসিএল অন্যান্য যেসকল সেবা সরবরাহ করছে তার উপর কোনো বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়নি। ফলে এ সকল সেবা সম্পর্কে মানুষ এখনও বিশেষ কিছু জানতে সক্ষম হচ্ছে না। তবে এসব সেবার জন্য কিছু লিফলেট, ফেস্টুন তৈরি করা হলেও তা পণ্য প্রসারে যথেষ্ট নয়।

৬.৬ অডিট সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

বিটিসিএলকে যেহেতু কোম্পানি করা হয়েছে সেখানে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হওয়া উচিত। এখানে সরকারি কোনো অডিট করার কথা নয়। আর সরকারি অডিট করতে হলে তা বাণিজ্যিক অডিট করার কথা। কিন্তু বিটিসিএলে সিভিল অডিট করানো হয়। এই অডিট কোম্পানি হিসেবে করা কার্যক্রমকে সরকারিভাবেই অডিট করে এবং অডিট আপত্তি প্রদান করে। অথচ প্রচারণার জন্য এসব কার্যক্রম প্রয়োজন রয়েছে। অডিটরগণ প্রথমেই যে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আসে তা হচ্ছে কোনো অর্থ ব্যয়ের অনুমোদন আছে কি না। ব্যয়ের অনুমোদন থাকলে যে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তা ব্যয় করা যৌক্তিক কিনা। যেহেতু তারা এখনও সরকারি হিসেবে বিটিসিএল এর ব্যয়কে বিবেচনা করছে সেহেতু বিটিসিএল বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে করা প্রচারণার ব্যয়কে অযৌক্তিক মনে করে এবং অডিট আপত্তি প্রদান করে। ফলে প্রচারণা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অডিট আপত্তি থেকে রেহাই পাবার জন্য প্রচারণার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। যেমন কোম্পানির প্রচারণার জন্য ক্যালেন্ডার তৈরী করা হয়। কিন্তু অডিট এর মতে উক্ত ব্যয়টি অযৌক্তিক ছিল এবং এতে রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় ঘটেছে। সে অডিট আপত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করা হলেও অডিট তা গ্রহণযোগ্য নয় বলে মন্তব্য প্রদান করে। আর এই ক্যালেন্ডার তৈরীর কাজে যারা জড়িত ছিল তাদের পেনশন হতে উক্ত ব্যয়ের টাকা কেটে রাখা হবে। অন্যদিকে বিটিসিএলের বিপণন বিভাগে স্থায়ী কোনো দক্ষ জনবল না থাকায় বিপণন সম্পর্কিত বিষয়ে সৃজনশীল পরিকল্পনা তৈরী ব্যাহত হচ্ছে যা পণ্যের প্রসারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

৬.৭ নীতিমালা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিটিসিএলকে দুর্বল করা

বিটিটিবি একটি সম্পূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল এবং টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে সকল ধরনের লাইসেন্স তারা প্রদান করত। এজন্য তারা তাদের স্থাপনাগুলোও সেভাবেই তৈরি করেছে। ১৯৯৮ সালে টেলিযোগাযোগ নীতিমালা অনুসারে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিটিটিবিকে একচেটিয়াভাবে আইসিএক্সের সুযোগ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ২০০৭ সালের ইন্টারন্যাশনাল লং ডিসটেন্স টেলিকমিউনিকেশন্স সার্ভিসেস পলিসি (আইএলডিটিএস) করে তা পরিবর্তন করা হয়েছে। এই পলিসির মাধ্যমে ২০০৭ সালে বিটিআরসি আরো তিনটি

কোম্পানিকে ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ের (আইজিডব্লিউ) লাইসেন্স প্রদান করে। এই তিনটি কোম্পানি বিটিআরসিকে টেরিফের[১৭] ৫১.৭৫% দিতে রাজি হয়। বিটিআরসি এই তিনটি কোম্পানির সাথে সাথে আইজিডব্লিউএর লাইসেন্স প্রাপ্ত কোম্পানি হিসেবে বিটিসিএলকেও এই ৫১.৭৫% টেরিফ প্রদানের জন্য ধার্য করে। এই টেরিফ বিটিসিএলের জন্য অতিরিক্ত বোঝা। এছাড়াও একটি আন্তর্জাতিক কল আদান-প্রদানে সর্বশেষ এক্সচেঞ্জ হিসেবে মোবাইল কোম্পানিকেও টেরিফ ভাগ করতে হয়। এভাবে একটি কল ইনকামিং এর ক্ষেত্রে সকল সংশ্লিষ্ট এএনএস অপারেটর ও বিটিআরসিকে মিনিট প্রতি টেরিফের মোট ২.৬০২৫ সেন্ট প্রদান করতে হয়। বাকি অংশ বিটিসিএলের সরঞ্জামাদি, জনবলের বেতন, বিপণন ইত্যাদির ব্যয় বাদ দিয়ে লাভ করতে হবে। পূর্বে বিটিটিবিকে এধরনের কোনো টেরিফ দিতে হত না এবং আন্তর্জাতিক কলের পুরো অংশই আয় হত বিটিসিএলের।

আবার বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক কলের ভলিউমের প্রেক্ষাপটে বিটিআরসি আরো ৪টি কোম্পানিকে আইজিডব্লিউর লাইসেন্স দেওয়ার সুপারিশ করলেও মন্ত্রণালয় থেকে তা অমান্য করে রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থরক্ষায় ২০১২ সালের ডিসেম্বরে আরো ২৫টি কোম্পানিকে এই লাইসেন্স প্রদান করে। এই কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্রায় ১০টি কোম্পানির মালিক হচ্ছে বর্তমান সরকার বা পূর্বের সরকারের সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীর আত্মীয়। এই কোম্পানিগুলো কিভাবে লাভবান হবে সেদিকে কোনো দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। কারণ সকল ব্যয় নির্বাহ করে একটি কোম্পানিকে লাভবান অবস্থায় না যেতে পারলে তখন তারা কল ফাঁকি দিয়ে নিজেদেরকে লাভবান করবে। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সরকার। বর্তমানে প্রতিদিন ৫৫ মিলিয়ন মিনিট আন্তর্জাতিক কল দেশে প্রবেশ করে যার মধ্যে ৩৬% কল অবৈধ পথে প্রবেশ করে থাকে।[১৮] মুখ্য তথ্যদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বিটিআরসির যেহেতু বিদেশ থেকে কত কল আসছে তা হিসাব রাখার প্রযুক্তি নেই তাই প্রাইভেট কোম্পানিগুলো খুব সহজেই বিটিআরসিকে ফাঁকি দিয়ে কম দামে (সর্ব নিম্ন ১.৫ সেন্ট প্রতি মিনিট) কল এনে দিতে পারছে। এসব কোম্পানি যেহেতু কম দামে কল করার সুযোগ দেয় সেহেতু গ্রাহকরা তাদের সেবার প্রতি বেশি আগ্রহ দেখায়। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দেখা যায় ২০১০ সালে বিটিসিএলের ইনকামিং কল ছিল প্রায় ৩৫৭ কোটি মিনিট যা ২০১৩ সালে এসে কমে গিয়ে দাড়ায় প্রায় ২০৯ কোটি মিনিটে।[১৯] পূর্বে আন্তর্জাতিক কল আদান-প্রদান করার জন্য যেহেতু শুধু বিটিটিবির গেটওয়েই ব্যবহৃত হত তাই আন্তর্জাতিক কলের অর্থ শুধু বিটিটিবি ও সরকারই পেত। বর্তমানে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের স্বার্থে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রদান করায় আন্তর্জাতিক কলের রাজস্ব শুধু বিটিসিএল এবং সরকার নয়, প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর মধ্যেও ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

৬.৮ বাজারে শেয়ার ছাড়ার চ্যালেঞ্জ

কোনো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার স্টক মার্কেটের মাধ্যমে বাজারে ছাড়া হয়, যেন বেসরকারি পর্যায়ে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ করার সুযোগ পায়। এর মাধ্যমে কোম্পানির মূলধন বৃদ্ধি পায় এবং জবাবদিহিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টেলিযোগাযোগ কোম্পানি বেশ কয়েক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং বাজারে শেয়ার ছাড়ার মাধ্যমে তাদের মূলধনে বেসরকারি বিনিয়োগ অনেক বেশি। আধুনিক প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে টেলিযোগাযোগ খাত বিকশিত হচ্ছে। এ সকল দেশের কোম্পানিগুলোর মূলধনের সমস্যা না থাকায় তারা নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করে জনগণকে উন্নত টেলিযোগাযোগ সেবা দিচ্ছে। বিটিসিএল পরিচালনা বোর্ডে যারা আছেন তাদের মধ্যে চারজন সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ, অর্থ ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব কিংবা অতিরিক্ত সচিব। বিটিটিবির সময়ও এসব কর্মকর্তাদের অনুমতিক্রমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হত। বিটিসিএল কোম্পানি হওয়া স্বত্তেও একই লোকদের সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়াও বিটিসিএলের শেয়ার বাজারে না ছাড়ার কারণে এটিতে যেমন মূলধনও বৃদ্ধি পাচ্ছে না তেমনি পরিচালনা বোর্ডেও কোনো পরিবর্তন আসছেনা। আবার কোম্পানি হিসেবে বাজারে শেয়ার ছাড়ার জন্য যেসব শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন তা বিটিসিএল পূরণ করতে পারছে না। যেমন কোম্পানির অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে অডিট এবং ব্যালেন্স শীট এ ক্রমবর্ধমান অর্থাৎ কমপক্ষে ৩ বছর লাভজনক অবস্থানে থাকা। বিটিসিএলের বর্তমান অডিট এবং ব্যালেন্স শীটে কোম্পানি ৩ বছর লাভজনক অবস্থানে নেই। কোনো কোম্পানির শেয়ার বাজারে আসার ক্ষেত্রে আরো একটি অন্যতম শর্ত হচ্ছে কোম্পানিটির নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারী থাকা। কিন্তু বিটিসিএলে কর্মরত জনবল এখনও সরকারি হিসেবেই কাজ করায় তাদেরকে কোম্পানির জনবল বলা যাচ্ছে না।

---

[১৭] বিটিআরসি প্রতি মিনিট আন্তর্জাতিক কল আনার জন্য ৩ সেন্ট হারে টেরিফ ধার্য করে।

[১৮] বিটিসিএলের ওয়েবসাইট, http://www.btcl.gov.bd/, ২৪ মার্চ ২০১৪।

[১৯] বিটিসিএলের আন্তর্জাতিক কল আদান প্রদানের চিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন পরিশিষ্ট ৪।

এমতাবস্থায় আর্থিক সহায়তা দিয়ে শেয়ার ছাড়লেও তা বিনিয়োগকারীদের নিকট আকর্ষণীয় হবে না। অন্যদিকে শেয়ার ছাড়ার যে প্রক্রিয়া চলছে তাতে বিটিসিএলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও অনিহা রয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়।

৬.৯প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা

প্রকল্প অনুমোদনে বিটিটিবির সময়ের তুলনায় সময় কম লাগলেও প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্বের মতোই সময় প্রয়োজন হয়। কারণ কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের ক্রয় নীতি পিপিআর অনুসরণ করতে হয়। ফলে গ্রাহকদের নতুন নতুন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিটিসিএল কর্তৃক গৃহিত প্রকল্পসমূহের কার্যকাল ও বর্তমান অবস্থা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বেশির ভাগ প্রকল্পেরই সময়মত কার্যক্রম শুরু ও শেষ হয় না। বেশিরভাগ প্রকল্পই যে নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন মেটানোর জন্য গ্রহণ করা হয় সেই সময়ের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। কারণ প্রকল্পের প্রস্তাবনা অনুমোদন করে দরপত্র আহ্বান থেকে শুরু করে সকল কার্যক্রম শেষ করে বাস্তবায়ন করতে দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও সময় পার করতে হয় যা বিটিসিএলের উন্নয়ন এবং গ্রাহক সেবায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। দেখা গেছে প্রকল্প প্রস্তাবনায় যে সময়ে কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা তার থেকে প্রায় ২ বছর পরে শুরু হয়। ক্ষেত্রবিশেষে প্রস্তাবনায় উল্লিখিত বাস্তবায়ন শেষ হওয়ার এসে কার্যক্রম শুরু হয়। ফলে গ্রাহকরা সময়ের প্রয়োজনে নতুন নতুন সেবা না পাওয়ায় বিকল্প কোম্পানির সেবা নেওয়ার প্রতি আগ্রহী হচ্ছে। এতে রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বিটিসিএল।

৬.১০ ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রক্রিয়ায় না আসা

এখনও পর্যন্ত বিটিসিএল সম্পূর্ণরূপে কোম্পানি হিসেবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারায় বিটিসিএলের সেবাদান, রাজস্ব আদায় কার্যক্রমসহ কোনো ব্যবস্থাপনাই অটোমেশন করা হয়নি। গ্রাহক সেবাসহ পুরো ব্যবস্থাপনার কাজ চলছে বহু বছর আগের সেই পুরনো নিয়মেই। ফলে গ্রামীনফোন, বাংলালিংক, রবির মতো বিভিন্ন কোম্পানির সাথে কল আদান প্রদানের রেকর্ডের সাথে বিটিসিএলের কলের রেকর্ডে অমিল দেখা দেয়। এভাবে একটি দুটি কোম্পানির সাথে কল রেকর্ডের তথ্যে অমিল প্রমানিত হওয়ায় অন্যান্য কোম্পানিগুলোও বিটিসিএলের তথ্যের ক্রটির বিষয়ে প্রশ্ন তুলছে এবং তারা বিটিসিএলের কাছে তাদের প্রাপ্য টেরিফ দাবি করছে। দেশীয় বিলিং প্রক্রিয়াটি কিছুদিন ধরে কম্পিউটারের মাধ্যমে হলেও আন্তর্জাতিক বিলিং প্রক্রিয়াটি এখনও ম্যানুয়্যালি হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বিলিং প্রক্রিয়াটি অটোমেশন করতে হলে যে আইসিএক্স মেশিন বসানো প্রয়োজন তা দীর্ঘ দিন ধরে ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। আইসিএক্স বসানোর কাজ প্রদানে ২ বার দরপত্র আহ্বান করা হলেও কাউকেই কাজ প্রদান করা হয়নি। ফলে বিটিসিএলের আন্তর্জাতিক কলের রেকর্ড নিয়েও প্রশ্ন উঠছে এবং এই রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রেও জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

৬.১১ ঋণ ও পেনশনের দায় এবং সরকারের নীতি অনুযায়ী অলাভজনক সম্প্রসারণ

প্রাইভেট মোবাইল কোম্পানির সাথে প্রতিযোগীতায় টিকতে হলে ফিক্সড ফোনের পাশাপাশি মোবাইল ফোন সেবা প্রদান করা জরুরি। এরকম ভাবনা থেকেই দীর্ঘদিন চেষ্টার পরে বিটিটিবির কর্মকর্তাগণ মোবাইল সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প হাতে নেয় যা ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে টেলিটক নামে মোবাইল সেবা প্রদান শুরু করে। এছাড়া বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেডও বিটিসিএলের একটি প্রকল্প ছিল যা সারা বিশ্বের সাথে টেলিযোগাযোগ করার ক্ষেত্রে SEA-ME-WE-4 (South East Asia-Middle East-Western Europe-4) প্রকল্প নামে কাজ সম্পন্ন করে। কিন্তু ২০০৮ সালে বিটিটিবিকে যখন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ঘোষণা করা হয় তখন এই দুটি প্রকল্পকেই দুটি আলাদা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ফলে বিটিটিবি থেকে বিটিসিএলে রূপান্তরের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানটির আয় বৃদ্ধির দু'টি সম্ভাবনাময় পথ বন্ধ হয়ে যায়। অথচ এই দুটি কোম্পানিই যে অর্থ ঋণ নিয়ে তৈরি করা হয় তা এখনও বিটিসিএলকেই বহন করতে হচ্ছে। আবার টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস) দোয়েল নামক স্থানীয়ভাবে ল্যাপটপ তৈরি বাবদও অর্থ ঋণ নিয়েছিল তাও বিটিসিএলকে বহন করতে হচ্ছে।

অন্যদিকে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গ্রামে-গঞ্জে ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিটিসিএলের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক ও এক্সচেঞ্জ বসানোর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু এসব প্রকল্প লাভজনক হওয়ার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে যথেষ্ট সংখ্যক গ্রাহক পাওয়া যাচ্ছে না। এসব এক্সচেঞ্জ পরিচালনার জন্য লোকবলসহ অন্যান্য ব্যয় কিন্তু বিটিসিএলকেই বহন করতে হচ্ছে। অলাভজনক হওয়া সত্বেও সরকারের গৃহীত নীতি বাস্তবায়নে বিটিসিএল এসব প্রকল্প নিতে বাধ্য হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে পার্বত্য এলাকায় ১৯টি এক্সচেঞ্জের কথা উল্লেখ করা যায় যেখানে এক্সচেঞ্জ

প্রতি মাত্র ২-৪টি সংযোগ রয়েছে। এসব প্রকল্প বিটিসিএলের জন্য আর্থিকভাবে বোঝাস্বরূপ। এক্ষেত্রে বিটিসিএলের লাভের দিকে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। আবার বিটিসিএলকে কোম্পানি করা হলেও বিটিটিবির সময়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশনের অর্থ প্রদান করতে হচ্ছে বিটিসিএলকেই। এর ফলেও প্রতিবছর প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা দিতে হচ্ছে।

৬.১২ গ্রাহক সেবা প্রদানে সীমাবদ্ধতা

৬.১২.১ *ক্যাবল সংকট*

বিটিসিএল এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকট হলো ব্যয়বহুল কপার ক্যাবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে টেলিফোন সংযোগ প্রদান এবং সঠিক রক্ষণাবেক্ষন করতে না পারা। এখনও নতুন লাইন পেতে গ্রাহকদের দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এক্সচেঞ্জের সংযোগ দেয়ার সক্ষমতা থাকলেও ক্যাবল সংকটের কারণে গ্রাহকদের সংযোগ পেতে দেরি হচ্ছে। এক্ষেত্রে গ্রাহকদের নিকট হতে বিটিসিএল কর্মচারীগণ ক্যাবল খরচ বাবদ অতিরিক্ত টাকা দাবি করে। এই টাকা প্রদান করা হলে সংযোগ পেতে কোনো সমস্যা হয় না গ্রাহকদের। ক্যাবল কেনার টাকা প্রদান করা হলে একদিনের মধ্যে লাইন লেগে যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে লাইনম্যানদের একটু বাড়তি টাকা দিলেই লাইনম্যান যেভাবেই হোক কেবলের ব্যবস্থা করে। পূর্বে একটি টেলিফোন লাইন পেতে গ্রাহকরা ২০ হাজার টাকা জমা দিত। এখন মাত্র ৬০০ টাকা জমা দিলেই লাইন দেয়া হচ্ছে। তবে এক্সচেঞ্জ থেকে গ্রাহকের নিকট সংযোগ পৌঁছে দিতে যে ক্যাবল কিনতে হয় তার ব্যয় অনেক বেশি। সংযোগ নেয়ার সময় গ্রাহকদের বিনামূল্যে ৫০ মিটার তার দেয়া হয়। কিন্তু এক্সচেঞ্জ থেকে যে সকল গ্রাহকের অবস্থান অনেক বেশি দূরে তাদের ক্যাবল কিনে দিতে হয়। আবার উপজেলার ক্ষেত্রে এক্সচেঞ্জ থেকে গ্রামাঞ্চলের দূরত্ব বেশি হওয়ায় ক্ষেত্র বিশেষে গ্রাহকদের ৬-৭ হাজার টাকার ক্যাবল কিনতে হয়। আর এ সকল কারণে নতুন লাইন সংযোগ পেতে গ্রাহকদের দেরি হচ্ছে। আবার যদি এমন এক জায়গা থেকে চাহিদা আসে যেখানে এক্সচেঞ্জ নেই এবং গ্রাহক সংখ্যা কম। সেখানে মাটির নীচ দিয়ে যদি তিন কিলোমিটার তামার ক্যাবল বসাতে হয় সেক্ষেত্রে ১ থেকে ১.৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

৬.১২.২ *বিচ্ছিন্ন লাইনের সংযোগ পেতে দীর্ঘ সময় লাগা*

ঘন ঘন টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন এখনও বন্ধ হচ্ছে না। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর বিটিসিএলে অভিযোগ করেও আগের মতোই দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়। বর্তমানে বিটিসিএলে অনলাইন অভিযোগ গ্রহণ, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ এবং টেলিফোনে সরাসরি অভিযোগ গ্রহণ সার্ভিস চালু রয়েছে। এই সকল অভিযোগ গ্রহণ সার্ভিস চালু থাকলেও অভিযোগ নেয়ার পর সমস্যা সমাধানে দায়িত্বে অবহেলার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। ভূগর্ভস্থ ত্রুটি দেখা দিলে দীর্ঘ সময় ধরে তা মেরামত করা হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাইনে কোনো সমস্যা দেখা দিলে বা বহুদিন ধরে বন্ধ থাকলে কেন সমস্যাটি দেখা দিয়েছে বা কেন দীর্ঘ দিন যাবত লাইনটি বন্ধ হয়ে ছিল সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়না। ফলে পুনরায় সংযোগ পেতে দীর্ঘ সময় ধরে গ্রাহকদের অপেক্ষা করতে হয়। প্রায়ই বিভিন্ন সেবা সংস্থার সড়ক খোঁড়াখুঁড়ির কারণে মাটির নিচে তার কাটা পড়ে সংযোগ বন্ধ হয়ে যায়। আবার আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল চুরির কারণেও অসংখ্য টেলিফোন অচল হয়ে যায়। নতুন তার লাগিয়ে লাইন সচল করতে আরেক দফা হয়রানির মুখে পড়তে হয় গ্রাহকদের।

৬.১২.৩ *পুরোনো এক্সচেঞ্জ চালু রাখা ও নতুন এক্সচেঞ্জ স্থাপনে সমস্যা*

ক্যাবল সমস্যা ও বিদ্যুৎ সংকটে কোনো কোনো সময় এক্সচেঞ্জ অফিসগুলোর কার্যক্রম ব্যাহত হয়। প্রযুক্তি পুরোনো হওয়ায় বিদ্যুত ও মেরামত খাতে বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় হচ্ছে। কোনো এক্সচেঞ্জে মাসে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল আসে। অথচ সে পরিমাণ আয় এক্সচেঞ্জগুলো থেকে আসে না। জেনারেটর থাকলেও জ্বালানি তেলের বরাদ্দ না থাকায় তা চালানো যায় না। ফলে এক্সচেঞ্জ চালু রাখাতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কোনো কোনো এক্সচেঞ্জ এতই পুরোনো যে সেখানে কোনো কমান্ড দেওয়া যাচ্ছে না। আবার পুরোনো এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে সেবা প্রদান করার কারণে অনেক ভ্যালু এ্যাডেড সার্ভিস যেমন শর্ট মেসেজ পাঠানো ইত্যাদি সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

অন্যদিকে নতুন ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপনের জায়গা ভাড়া নেওয়া ও বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতায় পড়তে হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়ার জন্য বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না এবং বড় অংকের অর্থ জামানত রাখতে হয় যা বিটিসিএলের

পক্ষে রাখা সম্ভব হয় না। প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর এ ধরনের সমস্যা না থাকায় তারা গ্রাহকদের দ্রুত এবং আধুনিক সেবা প্রদান করতে পারে।

৬.১২.৪ সেবা প্রদানে অন্যান্য সীমাবদ্ধতা

বিটিসিএল যে ল্যান্ডফোন সেবা প্রদান করে থাকে তার বিলিং পদ্ধতি হচ্ছে পোস্ট পেইড। কিন্তু বর্তমানে মানুষ শুধু পোস্ট পেইড সেবা নিতে চায় না তারা প্রি-পেইড সেবা নিতে বেশি আগ্রহী। ফলে গ্রাহকরা যেসব প্রাইভেট কোম্পানি প্রি-পেইড এবং পোস্ট পেইড দুই ধরনের সেবাই দিতে পারছে তাদের সেবার প্রতি বেশি আগ্রহী হচ্ছে। ডাটা লিংক সেবার ক্ষেত্রে বিটিসিএল বেশির ভাগই কপার কেবলের মাধ্যমে প্রদান করছে। ফলে আধুনিক অনেক সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু প্রাইভেট কোম্পানিগুলো ওয়ারলেস লোকাল লুপের মাধ্যমে সেবা প্রদান করায় তারা একই সাথে ডাটা এবং ভয়েসসহ অন্যান্য অনেক সেবা এর মাধ্যমে গ্রাহকদের দিতে পারছে। আর এ কারণে গ্রাহকরাও তাদের সেবার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে যার নেতিবাচক প্রভাবে বিটিসিএল গ্রাহক সংখ্যায় পড়ছে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে আইজিডব্লিউ সেবা এবং আইসিএক্সের সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রেও পুরোনো প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে বিটিসিএলের কল আদান-প্রদানের রেকর্ডের সাথে অন্যান্য কোম্পানি যাদের সাথে বিটিসিএলের কল আদান প্রদানের সাথে সংযুক্ত থাকতে হয়, সেসব কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারগুলোর কল রেকর্ডের তথ্যে অমিল দেখা দেয়। ফলে রাজস্ব ভাগাভাগির ক্ষেত্রে এক ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারগুলো এক্ষেত্রে প্রশ্ন তুলছে বিটিসিএল যে পরিমাণ রাজস্ব দাবী করছে সে পরিমাণ রাজস্ব তারা পাবে না। ফলে দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক কলের রাজস্ব আদায় করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে দেশীয় মোবাইল কোম্পানি যেমন গ্রামীনফোন, রবি, বাংলালিংকসহ অন্যান্য কোম্পানির সাথেও কল আদান-প্রদানের রেকর্ডে অমিল থাকার কারণে তারাও যে পরিমাণ রাজস্ব দাবি করছে বিটিসিএল তা দিতে অস্বীকার করছে। আবার বিটিসিএলও তাদের নিকট যে রাজস্ব দাবী করছে কোম্পানিগুলো তা দিতে রাজি হচ্ছে না।

প্রাইভেট আইজিডব্লিউ কোম্পানির সাথে বিটিসিএল প্রতিযোগীতায় না পারার আরো একটি কারণ হচ্ছে এসব কোম্পানির পরিচালনা ব্যয় অনেক কম। কারণ তারা ২০ থেকে ২৫ জন লোক নিয়ে একটি আইসিএক্স পরিচালনা করতে পারে কিন্তু বিটিসিএল প্রথম থেকেই অনেক বড় স্থাপনা নিয়ে কাজ করছে যার ব্যয় অনেক বেশি। আবার এসব কোম্পানি খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন নতুন টেকনলজি কিনে কার্যকর করতে পারে কিন্তু বিটিসিএলকে তার পুরোনো স্থাপনার মাধ্যমেই সেবা দিতে হচ্ছে। নতুন প্রযুক্তি ক্রয়ে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে বিটিসিএলকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। ফলে গ্রাহকরা বিটিসিএল থেকে অন্য কোম্পানির সেবার প্রতি বেশি আগ্রহী হয়।

৭. বিটিসিএলের অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র

৭.১ আন্তর্জাতিক কল আদান প্রদানে বিটিসিএলের দুর্নীতি

৭.১.১ আন্তর্জাতিক শাখার দুর্নীতি -বাংলাদেশে থেকে বিদেশী কোম্পানি সেজে রাজস্ব ফাঁকি

বিটিসিএল এর আয়ের ৬০% আসে আন্তর্জাতিক কলের মাধ্যমে বৈদেশিক টেলিযোগাযোগ থেকে। আন্তর্জাতিক কল আদান-প্রদানের জন্য বিদেশি টেলিকম কোম্পানির সঙ্গে বিটিসিএল এর ভয়েস কল লেনদেন চুক্তি হয়। নিয়ম অনুযায়ী আন্তর্জাাতিক ক্যারিয়ারগুলো প্রতি মিনিট ভয়েস কলের জন্য নির্ধারিত ডলার রেট ৩ সেন্ট হিসেবে বিটিসিএলকে বৈদেশিক মুদ্রায় ভয়েস কলের মূল্য পরিশোধ করবে। বিটিসিএল এর পলিসি অনুযায়ী বিদেশী এই ক্যারিয়ারগুলোর কাছ থেকে জামানত হিসেবে ইউএস ডলারে মূল্য পরিশোধের ব্যাংক গ্যারান্টি নেয়া হয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী ব্যক্তি, টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং বিটিসিএলের আন্তর্জাতিক শাখার অসাধু কিছু কর্মকর্তার যোগসাজশে কিছু ব্যবসায়ী বিদেশী কোম্পানি সেজে বাংলাদেশে বসে এই ব্যবসা পরিচালনা করে। তারা ইউএস ডলারে ব্যাংক গ্যারান্টি না দিয়ে স্থানীয় মুদ্রায় ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি দেয়। উদাহরণ হিসেবে ২৬ কোটি টাকার ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি দেয়ার দায়ে সোনালী ব্যাংক বাড্ডা শাখার ম্যানেজারকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠানো হয়। এরফলে বৈদেশিক মুদ্রা আয় থেকে বঞ্চিত হয় বিটিসিএল। এসব কোম্পানি কিছু দিন ব্যবসা করে ব্যাংক গ্যারান্টির তুলনায় অনেক বেশি অংকের বিল জমা করে। এসব

বিল সঠিক সময়ে পরিশোধ না করে বাকি রেখে অফিস ফেলে চলে যায়। পূর্বের এই কোম্পানিটিই নতুন নামে নতুন আদলে একই কাজের জন্য পুনরায় বিটিসিএলের নিকট থেকে কল অদান প্রদানের অনুমতি গ্রহণ করে। বিটিসিএলের ইন্টারন্যাশনাল শাখা বিষয়গুলো জানা সত্ত্বেও তাদের নিকট হতে অবৈধ অর্থ গ্রহণ করে পুনরায় তাদের কাজ দেয়।

আন্তর্জাতিক কল আদান প্রদানের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের কাছে বিটিসিএল এর পাওনা রয়েছে প্রায় ৯৬৫ কোটি টাকা। এর মধ্যেও রয়েছে ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি। ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে প্রায় বর্তমানে ৫০০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে যা প্রায় আদায়যোগ্য নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বড় অংকের পাওনা থাকা ক্যারিয়ারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তা কয়েক বছর পর অনাদায়ী দেখানো হচ্ছে। বিটিসিএলের নিজস্ব হিসাবের তালিকায় দেখা গেছে, ৫৪টি ক্যারিয়ারের কাছে বিটিসিএল এর বকেয়া পাওনা ছিল ৬ কোটি ৩৫ লাখ ৬৭ হাজার ডলার। অথচ এই ক্যারিয়ারগুলোর কাছ থেকে প্রাপ্ত বিটিসিএলের ব্যাংক গ্যারান্টি ছিল মাত্র ২ কোটি ৫৭ লাখ ৫৯ হাজার ডলারের। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির মতে, এই তালিকা পূর্ণাঙ্গ নয়। আরো অনেক হিসাব এখানে অন্তর্ভূক্ত হয়নি। তালিকায় দেখা গেছে, এমন কোম্পানিও আছে যাদের ব্যাংক ড্রাফটের চেয়ে পাঁচ গুন বেশি বকেয়া পড়েছে। অন্যদিকে ব্যাংক গ্যারান্টিবিহীন প্রি-পেইড পদ্ধতির ক্যারিয়ারগুলোর ক্রেডিট অনেক আগে শেষ হবার পরও তাদের টেলিফোন কল নিয়েছে বিটিসিএল। নিয়মানুসারে প্রতি মাসে বিল আদায় করার ব্যবস্থা রাখা হলেও তিন বছর আগে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এমন কোম্পানির কাছেও শত কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে বিটিসিএলের। আর আন্তর্জাতিক শাখার এরকম উদাসীনতা ও অনিয়ম অব্যাহত থাকার কারণে আর্থিকভাবে বিটিসিএল ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সরকার রাজস্ব হারায়। এ সম্পর্কে দুর্নীতি দমন কমিশন আদালতে মামলা করলে বিটিসিএল ২২টি ক্যারিয়ারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। বর্তমানে বিটিসিএলের কোনো প্রাইভেট ক্যারিয়ার নেই। বর্তমানে মোট ২০টি জাতীয় ক্যারিয়ারের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক কল আদান প্রদান চলছে।

বকেয়া থাকা বিল আদায়ের ক্ষেত্রে বিটিসিএল বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হচ্ছে। এর মধ্যে ক্যারিয়ারগুলোর আদালতের মামলা করা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোনো কোনো ক্যারিয়ারের ব্যাংক ড্রাফটের অর্থ ক্যাশ করা যাচ্ছে না। তারা আলাদত থেকে রায় নিয়ে ব্যাংক ড্রাফটের অর্থ উত্তোলন স্থগিত করে রাখছে। উদাহরণ হিসেবে একটি কোম্পানির কথা উল্লেখ করা যায় যার নিকট বিটিসিএলের ১৪০ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে এবং ব্যাংক ড্রাফট রয়েছে ৬৫ লক্ষ টাকা। বিটিসিএল এই ৬৫ লক্ষ টাকা ক্যাশ করাতে গেলে ক্যারিয়ারের মালিক আদালতের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এভাবে আদালতের রায় নিয়ে ক্যারিয়ারগুলো সহজেই অর্থ না দিয়ে চলে যেতে পারছে। বিটিসিএলের কর্মকর্তাগণ আদালত অবমাননার ভয়ে সঠিকভাবে তাদের অর্থ আদায় করতে পারছে না।

বর্তমানে বিটিাারসি যেসব কোম্পানিগুলোকে আইজিডব্লিই ও আইসিএক্সের লাইসেন্স দিয়েছে তাদের মধ্যে অনেকগুলোই বিটিসিএলের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার হিসেবে বড় অংকের অর্থ বকেয়া রেখে নতুন করে বিটিআরসির কাছ থেকে লাইসেন্স নিচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে তিনটি কোম্পানির নাম উল্লেখ করা যায়। এরা হচ্ছে - ***ডিজি টেক*** যারা বিটিসিএলে ৯৬ কোটি টাকা বকেয়া রেখে বিটিআরসির নিকট থেকে ***টেলেক্স*** নামে আইজিডব্লিই এবং ***টেলি এক্সচেঞ্জ*** নামে আইসিএক্সের লাইসেন্স নেয়। অন্য দুটি কোম্পানি হচ্ছে ***টেলকো টেক*** (বিটিআরসি থেকে যে নামে লাইসেন্স নেওয়া হয়) যার বিটিসিএলে নাম ছিল ***কারটেক্স টেলিকম লিমিডেট ইউকে*** এবং ***নিউ জেনারেশন টেলিকম লিমিটেড*** (বিটিআরসি থেকে যে নামে লাইসেন্স নেওয়া হয়) যার বিটিসিএলে নাম ছিল ***জিডিএক্সসি-ইউকে***। ইতিমধ্যে বিটিআরসিরও নতুন আইজিডব্লিউ কোম্পানিগুলোর কাছে ১ হাজার কোটি টাকা বকেয়া পড়েছে যা বার বার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না। ১০টি কোম্পানির কল আদান প্রদান বকেয়া আদায় না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। বস্তুত এসব কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল করলেও তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ তারা ইতিমধ্যে যে পরিমাণ আয় করেছে তা বিটিআরসির লাইসেন্স ফির তুলনায় অনেক বেশি।

৭.১.২ আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জের দুর্নীতি -আন্তর্জাতিক কলের রেকর্ড টেম্পারিংয়ের মাধ্যমে রাজস্ব আত্মসাৎ

অভিযোগ রয়েছে যে বিটিসিএলের আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জের কর্মকর্তাদের যোগসাজশে কারিগরি ত্রুটির অভিযোগ দেখিয়ে ফোন কলের রেকর্ড টেম্পারিং করা হয়। ২০১১ সাল থেকে ২০১২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এই আন্তর্জাতিক কলের রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে না। একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিটিসিএলের এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে দিনে কত মিনিট বৈদেশিক কল আদান প্রদান হয়েছে, তার কোনো হিসাব নেই। কারণ

হিসাব পাওয়ার যন্ত্র মহাখালী আইটিএক্স এর সিডিআর (কল ডিটেইল্ড রিপোর্ট) পাওয়া যাচ্ছে না। প্রায় ২ বছর ধরে সিডিআর নষ্ট বলে অভিযোগ তোলা হয়। অথচ এই সিডিআর এক মিনিটের জন্যও নষ্ট হওয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক বিষয়।

২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিটিসিএলকে ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ (আইসিএক্স) লাইসেন্স দেয়া হলেও দীর্ঘদিন এ এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হয়নি। ফলে খুব সহজেই কল টেম্পারিং করা সম্ভব হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন কল ভলিউম প্রতিবেদন বিটিআরসিতে জমা দেয়া হয়নি। যান্ত্রিক ও কারিগরি ক্রটির অভিযোগে প্রায়ই এর ডাটা রেকর্ড পাওয়া যায়নি বলা হয়। প্রতিদিন বিদেশ থেকে আসা কলের সংখ্যা ক্রমে বাড়তে থাকলেও সরকারি রেকর্ডে তা কম দেখানো হয়। নিরবচ্ছিন্নভাবে এবং দ্রুত আন্তর্জাতিক কল আদান প্রদানে বিটিসিএলের কাছে যেখানে ৪৪টি এসটিএম-১ (সিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সপোর্ট মডিউল) রয়েছে সেখানে আন্তর্জাতিক কল আদান প্রদানে লাইসেন্সপ্রাপ্ত মীর টেলিকম ও নভোটেলের ৫টি করে এবং বাংলাট্রাকে ৪টি এসটিএম-১ রয়েছে। অথচ বিটিসিএল ঐসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের একটিরও সমান বৈদেশিক কল আনা নেয়া করতে পারেনি। তাই সঙ্গত কারণেই অবিযোগ রয়েছে যে বিটিসিএলের কিছু অসাধু কর্মকর্তা গেইটওয়ের তথ্য রেকর্ড বন্ধ করে রেখে বা রেকর্ড মুছে দিয়ে সরকারকে রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করে। যেখানে প্রতিদিন গড়ে আন্তর্জাতিক কলের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৫০ লাখ মিনিটেরও বেশি সেখানে কল মুছে দেওয়ার কারণে কল কমে দাড়িয়েছে ১ কোটি ৭০ লাখ মিনিট। মূখ্য তথ্যদাতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে কল রেকর্ড টেম্পারিং এবং অন্যান্য আইসিএক্স ও মোবাইল কোম্পানিগুলোর পাওনা বাবদ ২০১০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত বিটিসিএল প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা রাজস্ব ও ক্ষতির সম্মূখীন হয়েছে।

বিটিসিএলের নতুন আইটিএক্স না বসানোর কারণেই আন্তর্জাতিক কলগুলো ডাইভার্ট করে মোবাইল অপারেটরদেরকে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বিটিআরসি নতুন আইটিএক্স বসানোর জন্য ১৯ বার বিটিসএলকে চিঠি দিলেও আইটিএক্স বসানো কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় অবগত থাকলেও তারা কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এই মেশিন না বসানোর জন্য বিটিসিএলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে সাথে মন্ত্রণালয়েরও যোগসাজশ থাকার বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। বিটিসিএলের কল টেম্পারিংয়ের সাথে আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জ শাখার একাধিক কর্মকর্তা জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া যায়। মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে, মেইন্টেনেন্স এন্ড অপারেশন্স এর পূর্ববর্তী সদস্যকে অবৈধ ভিওআইপির গডফাদার হিসেবে গণ্য করা যায়। সে সরকারি সকল পর্যায়ে ঘুষ প্রদান করে ব্যবসায়িক পরিবেশ নিজ অনুকূলে রাখত। এক্ষেত্রে বিটিসিএলের অনেক কর্মকর্তাসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া যায়।

গত ২২ নভেম্বর ২০১২ সংসদ সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় কমিটির বৈঠকে বলা হয়েছে, কয়েক মাস আগে বিটিসিএলের আইটিএক্স বিভাগের জিএমসহ সংশ্লিষ্ট ৪জন কর্মকর্তাদের বদলি করা হয়। কল টেম্পারিংয়ের জন্য দুদক বিটিসিএলের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ৭০০ কোটি টাকা আত্মসাতের ৪টি মামলা দায়ের করে।

অভ্যন্তরীণ কলের ক্ষেত্রেও বিটিসিএলের কারিগরি সমস্যা দেখা দেয়। ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের অভ্যন্তরীণ কলেরও সঠিক হিসাব তাদের কাছে ছিল না। অনেক বিল আগের বিলের গড় অনুযায়ী করা হয়। উদাহরণ হিসেবে উত্তরা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের প্রায় ১৪ হাজার টেলিফোনের বিল আগের ছয় মাসের বিলের গড় ভিত্তিতে নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেয়। বিটিসিএলের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এসব টেলিফোনের স্থানীয় কলের (মোবাইল ফোনে কল করাসহ) মিটার রিডিং কারিগরি ত্রুটির কারণে ১১ আগষ্ট থেকে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত তিন মাসের স্থানীয় কলের রেকর্ড রাখা সম্ভব হয়নি।

৭.১.৩ অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসা

বাংলাদেশে দিন দিন ভিওআইপির[২০] ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে। পরিসংখান অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি ভিওআইপির মাধ্যমে কল হয় ভারতে (৩০%), দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভিওআইপির মাধ্যমে কল হয় বাংলাদেশে (২৬%)।[২১] সাধারণ গেটওয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক

---

[২০] বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট ৪ দেখুন

[২১] Prof. Mirza Golam Rashed, VoIP: A Technological Gift for the Third World Perspective: Bangladesh, June 2011. http://www.comjagat.com/archive/articleimage/2011_06_57_VoIP_A_Technological_Gift.pdf, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩

কল আদান-প্রদানের তুলনায় ভিওআইপির মাধ্যমে কল আদান-প্রদান সস্তা হওয়ায় মানুষ ভিওআইপির মাধ্যমে কল করতে বেশি আগ্রহী হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভিওআইপি উন্মুক্ত হলেও বাংলাদেশে ভিওাইপি কল করার জন্য একটি বৈধ পথ রয়েছে। এই বৈধ পথকে বাইপাস করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কল আদান-প্রদানকেই অবৈধ ভিওআইপি বলা হচ্ছে।

অবৈধ ভিওআইপি বন্ধ করার জন্য সরকার অনেক ধরনের পদক্ষেপ নিলেও বিটিসিএলের কর্মকর্তাদের যোগসাজসে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নির্বিঘ্নে এই ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারছে। বিটিসিএলে ডিপ প্যাকেট ইন্সপেকশন (ডিপিআই) স্থাপনের মাধ্যমেই এই অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করা সম্ভব হলেও বিটিসিএল তা করেনি। টিডিএম প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যান্ডউইথ সেবা প্রদান করার জন্য বিটিসিএলের ব্যন্ডউইথে পরিমাণ কত তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। ফলে কত অংশ বৈধ পথে আর কতটুকু অবৈধ পথে ব্যবহার করা হচ্ছে তা কারো পক্ষেই বলা সম্ভব হচ্ছে না। এভাবে বিটিসিএলের গেটওয়ে এবং অবকাঠামো অবৈধ পথে ব্যবহার করে অবৈধ ভিওআইপি করা হচ্ছে। ফলে বিটিসিএল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

অন্যদিকে ভিওআইপি একটি প্রযুক্তি এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে এই ব্যবসা পরিচালনা করায় বিটিআরসির পক্ষে তা ধরা সম্ভব হচ্ছে না। মনিটরিং প্রযুক্তিকে পাশ কাটাতে *’টানেলিং’* করতে শুরু করেছে অবৈধ কল টার্মিনেশনের ব্যবসায়ীরা। টানেলিং করায় বিটিআরসিতে স্থাপিত সিম ডিটেকশন বক্সে আর অবৈধ কলের হিসাব জমা পড়ছে না। আর যেহেতু আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে করা এ ধরনের অবৈধ ব্যবসা ধরার কোনো প্রযুক্তি বিটিআরসি ব্যবহার করা হচ্ছে না সেহেতু খুব সহজেই ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারছে অবৈধ ব্যবসায়ীরা। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, স্পেন, সিঙ্গাপুর, জাপান ও থাইল্যান্ডের একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক টেলি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দেশীয় বিভিন্ন চক্রের যোগসাজশে এই ব্যবসা চলছে।

বর্তমানে বিটিসিএল ও ম্যাঙ্গো কোম্পানি ছাড়া আরো ৩৭টি কোম্পানিকে আইআইজির লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং অবৈধ ভিওআইপি করার জন্য শুধু বিটিসিএল নয় অন্যান্য কোম্পানিগুলোর গেটওয়েও এখন ব্যবহৃত হচ্ছে যার হিসাব বিটিআরসি রাখতে পারছে না। ভিওআইপি করার জন্য বিভিন্ন উপজেলা পর্যায়ের বিটিসিএলের অফিস ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে। এমনকি বিটিসিএলের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা অফিসেও প্রাইভেট কোম্পানির যন্ত্রপাতি রেখে তাদেরকে ব্যবসায় সহায়তা করা হচ্ছে। অথচ বিটিসিএল লাভজনক অবস্থানে পৌঁছাতে পারছে না। বর্তমানে ভিওআইপি করার জন্য বিটিআরসি ৮৪৪টি প্রতিষ্ঠানকে ভিএসপি লাইসেন্স প্রদান করেছে।

৭.২ অবৈধভাবে কোম্পানির ভূমি দখল প্রদান

সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিটিসিএল এর ভূমির পরিমান দ্বিতীয়। সারাদেশে বিটিসিএল’র ভূমি রয়েছে ১৮৪৩.২৯ একর। শুধু ঢাকাতেই রয়েছে ১৯৬.১৯ একর জমি। বিটিসিএলের এই ভূমি অনেক জায়গায়ই দখল হয়ে যাচ্ছে। বিভাগীয় প্রকৌশলী-এস্টেট এর সহায়তায় কোম্পানির ভূমিগুলো এনওসি (No Objection Certificate) নিয়ে অবৈধ দখলদাররা দখল করে নিচ্ছে। সেখানে তারা বিল্ডিং তৈরী করে সেগুলো বিক্রিও করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বনানীতে অবস্থিত কোম্পানির ভূমি। কোম্পানির ভেতরের এবং বাইরের উভয় পক্ষই এই দখলীকরণের সাথে সম্পৃক্ত। নিম্নে বিটিসিএল এর কিছু জমি দখলের ঘটনা তুলে ধরা হলো।

বক্স ১: ভূমি দখলে অনিয়ম-দুর্নীতির কিছু চিত্র

কেইস ১: খুলনা সিটি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন খুলনার নির্বাচিত এমপি'র ভাই। তিনি সরকারি কাজে কোম্পানির ভূমি লীজ নেয়ার কথা বলে কোম্পানিকে চিঠি প্রদান করে। কিন্তু কোম্পানির খুলনা শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তা দিতে অসম্মতি জানালে তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। কারণ তিনি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, চিঠিতে সরকারি কাজে ভূমি লীজ নেয়ার কথা উল্লেখ থাকলেও এর মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু। এ সকল ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের নিকট একবার ভূমি চলে গেলে তারা তা আজীবন দখল করে রাখে। এ বিষয়সমূহ বিবেচনা করে কোম্পানির প্রধান কার্যালয় হতে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করায় জমিটি দখল হওয়ার আশংকা হতে মুক্ত হয়। উৎস-মূখ্য তথ্যদাতা

কেইস ২: মতিঝিলে অবস্থিত কোম্পানির একটি ভূমি একটি বিশেষ মহল লীজ নেয়ার আবেদন করে। প্রাথমিকভাবে উক্ত আবেদন নাকচ করা হলে তারা ভূমিটি পাওয়ার জন্য সিবিএ নেতাদের ঘুষ প্রদান করে। সিবিএ নেতাগণ মেম্বার, প্রশাসনকে অবৈধ টাকা প্রদান করে উক্ত মহলটিকে জমিটি পাইয়ে দিতে সহায়তা প্রদান করে। উৎস-মূখ্য তথ্যদাতা

কেইস ৩: কড়াইলে অবস্থিত বিটিসিএলের ভূমির কিছু অংশ প্রায় বেদখল অবস্থায়। একটি ইন্সুরেন্স কোম্পানি এই জমি দখলে করে রেখেছে। এই কোম্পানিটি উক্ত জমিটির ভুয়া এনওসি সনদ তৈরী করে জমিটি দখল করে আছে। এই দখলের সাথে বিটিসিএল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতায় করা সম্ভব হয়েছিল। বর্তমানে বস্তিবাসীদের দখলে রয়েছে এই জমি। এই জমির চারদিকে দেয়াল ঘেরাও করা হয়েছে। কিন্তু ভিতরে যে দখল হয়ে যাচ্ছে তা কেউ দেখছেনা। উৎস-মূখ্য তথ্যদাতা

কেইস ৪: কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন কলাতলীর উঁচু পাহাড়ে স্থাপিত বিটিসিএল এরকম মাইক্রোওয়েভ স্টেশনের ৪ একর জমি এরই মধ্যে বেদখল হয়ে গেছে। যার আনুমানিক মূল্য ৮০ কোটি টাকা। সরকারি দল সমর্থক অবৈধ দখলদাররা এরই মধ্যে পাহাড়ের মাটি কেটে বহুতল ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। ফলে পাহাড়ের চূড়ায় ৯শ' কোটিরও বেশি টাকায় নির্মিত বিটিসিএলের মাইক্রোওয়েভ স্টেশনটি যেকোনো সময় ধসে পড়ার আশংকা রয়েছে। উৎস-মূখ্য তথ্যদাতা

৭.৩ প্রশিক্ষণে অনিয়ম

প্রশিক্ষণের কোনো নীতিমালা নেই। বিদেশে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কর্মকর্তারাই বেশি সুযোগ পান। এই কর্মকর্তারা দলীয় প্রভাব খাটিয়ে এবং লবিং করে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। দেশে ফেরত এসে তাদের এই প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের কোনো প্রয়োগ হয় না। তারা এই জ্ঞান কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে শিখিয়েও দেন না। আবার প্রশিক্ষণলব্ধ এই জ্ঞান বিটিসিএলের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে হস্তান্তরের জন্য যে যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তা বিটিসিএলে নাই। কাজের সাথে সম্পর্কহীন বিষয়ে প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়। যেমন যিনি ক্যাবল নিয়ে কাজ করছেন তাকে পাঠানো হচ্ছে সুইচিং বিষয়ের উপরের প্রশিক্ষণে। ফিরে এসে তাকে আবার ক্যাবল শাখায়ই কাজ করানো হয়। ফলে প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান তিনি বিটিসিএলে কাজে লাগাতে পারে না। একই কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট না হয়েও বার বার বিদেশে প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়। কোনো কোনো কর্মকর্তার ক্ষেত্রে দেখা গেছে তাদের চাকরির মেয়াদ মাত্র ৩ মাস বা ৬ মাস রয়েছে তাদেরকে ২ মাস বা ৩ মাসের প্রশিক্ষণে পাঠানো হচ্ছে। ফলে প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে এসেই তাদেরকে অবসরে যেতে হয় বলে তার জ্ঞান বিটিসিএলের কোনো কাজে লাগানো যায় না। আবার প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন ব্যক্তিদেরও প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়। যেমন, ১৭১ প্রকল্পের কার্যক্রমের দায়িত্ব শুধু ঢাকার কর্মকর্তাদের থাকলেও সেখানে ঢাকার বাইরে কাজ করছে এমন কর্মকর্তাদেরও প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়েছে।

৭.৪ বদলি ও দায়িত্ব (চলতি বা অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতি

বিটিটিবি'র সময়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদায়ন, বদলি এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির চিত্র টিআইবির পূর্বের গবেষণায় উঠে আসে। এরপরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে দুদক ও টাস্কফোর্সের হস্তক্ষেপের কারণে এ সময়ে এধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি কম পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে এ ধরনের দুর্নীতি আবারও পরিলক্ষিত হয় বলে তথ্য পাওয়া যায়। বদলির জন্য বিটিসিএলের কোনো নীতিমালা তৈরি হয়নি।

বর্তমানে রাজনৈতিক বিবেচনা, কর্মচারী ইউনিয়ন ও সিবিএ'র চাপ এবং কর্মকর্তাদের ইচ্ছানুযায়ী বিটিসিএল এর বদলি নিয়ন্ত্রিত হয়। যেসকল পদগুলোতে অবৈধ অর্থ আয়ের সুযোগ বেশি সেসব পদে পদায়নের ক্ষেত্রে কর্মকর্তারা রাজনৈতিক প্রভাব ও ব্যক্তিগত লবিংয়ের মাধ্যমে পদায়ন নিয়ে থাকে। সদস্য ও পরিচালক - মেরামত ও সংরক্ষণ, বিভাগীয় প্রকৌশলী- আন্তর্জাতিক, বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী ও উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী-ফোনস্ বহি, পরিচালক - ইন্টারন্যাশনাল, বিভাগীয় প্রকৌশলী - ইন্টারনেট (ব্যান্ড উইথ বন্টন) এবং পরিচালক- প্রশাসন পদগুলোতে অবৈধ অর্থ আয়ের সুযোগ থাকায় এসব পদে সকলে পদায়ন পেতে চায় । এছাড়া বিভাগীয় প্রকৌশলী -বিল্ডিং (আবাসন দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন আবাসন তৈরী এবং সে নিমিত্তে দরপত্র আহ্বান করার কাজ করে থাকে) ও প্রকল্পে নিয়োগ পাবার জন্য সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিভিন্নভাবে তদবির বা লবিং করে থাকে। বিল্ডিং শাখার বিভাগীয়

প্রকৌশলীকে বাজেট ব্যয়ে অনিয়ম করার কারণে দুদক তার বিরুদ্ধে তদন্ত করে এবং তাকে এ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এমডিকে ধরে তিনি আবার বিল্ডিং এবং পরিবহন উভয় শাখার দায়িত্বে যোগ দেন। সম্প্রতি তাকে বিল্ডিং থেকে স্থানান্তর করে শেরে বাংলা-নগর (অভ্যন্তরীণ) শাখায় দেওয়া হয়।

বিটিসিএলে কোনো কোনো কর্মকর্তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে বলে তথ্য পাওয়া যায়। মহাখালি আন্তর্জাতিক গেইটওয়ে আইটিএক্স -এ ডিই এবং এডিই হিসেবে সৎ কর্মকর্তাদের দেয়া হয়না বলে তথ্য পাওয়া যায়।

নীতিমালা না থাকার জন্য কোনো কোনো কর্মচারীর অনেক বার বদলি হচ্ছে আবার কোনো কোনা স্টাফের কোনো বদলিই হচ্ছে না। উদাহরণ হিসেবে একজন কর্মচারীর কথা উল্লেখ করা যায় যাকে গত পাঁচ বছরে ১৭ বার বদলি করা হয়। অথচ এমন অনেক কর্মচারী রয়েছে যাদের ২০ বছর ধরে বদলি করা যাচ্ছে না। বদলি করা হলে সিবিএ ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তা বন্ধ করা হয়। ফলে এসব কর্মচারীরা দিনের পর দিন গ্রাহক হয়রানি, দুর্নীতি ও দায়িত্বে অবহেলা করলেও তার জন্য কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না।

অন্যদিকে বিটিসিএলে দায়িত্ব দেখাশুনার নামে চলছে আরেক ধরনের দুর্নীতি। ২৫তম বিসিএস এর পরে বিটিসিএলে ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগ এবং ১৯৯০ সালের পরে কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। ফলে সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী, উপ বিভাগীয় প্রকৌশলীর অনেক পদ বর্তমানে খালি থাকায় অনেক উপ-সহকারী প্রকৌশলী, মেকানিক ও টেকনিশিয়ানদের দুই তিন ধাপ উপরের এই পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেখাশুনা করতে দেওয়া হয়েছে। এসব পদে সাধারণত ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ হয়ে থাকে। এই সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর মাধ্যমেই সকল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় করা হয়। এই রক্ষণাবেক্ষণের অর্থ আত্মসাত করার জন্যই এসব পদে নিম্ন পদস্থ কর্মচারীরা কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদান এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পদায়ন নিয়ে থাকে। এসব কর্মচারীদের অনেকেরই প্রকৌশল বিষয়ে কোনো ডিগ্রি নাই। এসব কর্মচারীরা সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর জন্য বরাদ্দকৃত গাড়ি ব্যবহারসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করছে। বিটিসিএলের নিয়ম অনুসারে চলতি বা অতিরিক্ত দায়িত্ব দিতে হলে সমপর্যায়ের স্টাফকেই দিতে হবে। কিন্তু এখানে নিয়ম লঙ্ঘন করে, অবৈধভাবে কর্মচারীদের পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

৭.৫ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের অনিয়ম-দুর্নীতি

এ খাতে বাৎসরিক বাজেট প্রায় দেড়শ কোটি টাকা। বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়ের খরচ ছাড়াও এ খাত থেকে সিবিএ নেতা ও মন্ত্রীকে অবৈধভাবে টাকা প্রদান করতে হয়। কোনো বিভাগীয় প্রকৌশলীকে এ খাতের খরচ বাবদ ১ কোটি টাকা দেয়া হলে সিবিএকে দিতে হয় প্রায় ৭ লাখ টাকা। এই ৭ লাখ টাকার হিসাব তাকে মাসিক খরচের বিভিন্ন ভুয়া ভাউচার দেখিয়ে বা অন্য কোনো ভাবে মেলাতে হয়। সেই সাথে উক্ত কর্মকর্তাও অবৈধভাবে কিছু টাকা আত্মসাৎ করে। মুখ্য তথ্যদাতার মতে, 'বরাদ্দকৃত টাকার সর্বোচ্চ ২০% সংশ্লিষ্ট খাতের কাজে ব্যয় হয় আর বাকিটা অবৈধ খরচ হয়'। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্রয়কৃত জিনিসের দাম বাজার দরের চেয়ে বেশি দেখানো হয়। ৮০০ টাকার কার্টিজ ৪০০০ টাকায় কেনার উদাহরণ রয়েছে। এ ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে যদি কোনো কর্মকর্তা পদক্ষেপ নিতে চায় তাদেরকে ক্ষেত্র বিশেষে স্টান্ড রিলিজ করে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে থাকে। উদাহরণ হিসেবে রংপুরে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা খরচ দেখিয়ে মাত্র ২০% অর্থের সঠিকভাবে কাজ করানো হলে তার প্রতিবাদে এক কর্মকর্তাকে স্টান্ড রিলিজ করা হয়।

৭.৬ পরিবহণ খাতে দুর্নীতি

বিটিসিএল কোম্পানি হিসেবে ঘোষণার পরে গত তত্তাবধায়ক সরকারের সময়ে পরিবহণ শাখার দুর্নীতি কিছুটা কমলেও এখনও এই খাতে দুর্নীতি সংঘঠিত হয় বলে গবেষণায় দেখা যায়। বিটিটিবির মত বিটিসিএলের গাড়িও মন্ত্রণালয় ব্যবহার করে। আর এ ব্যয়টিও অন্যান্য খাতে দেখিয়ে তা তুলে নেওয়া হয়। শুধু মন্ত্রী নয়, মন্ত্রীদের সচিব পর্যন্ত কোম্পানির গাড়ি ব্যবহার করে। কখনও কখনও মন্ত্রণালয়ের পিয়ন ও কেরানীও বিটিসিএলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে গাড়ি পাঠিয়ে দেবার কথা বলে। এ শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা-

কর্মচারীদের দুর্নীতি করার অনেক সুযোগ থাকায় এখানকার প্রায় সকল পদে পদায়নের জন্য ঘুষ লেনদেন বা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ প্রয়োজন হয়। পূর্বে নিজেরা বিল বানিয়ে টাকা তুলে নেওয়ার সুযোগ থাকায় এ শাখার দুর্নীতি রোধে নতুন নিয়ম করা হয়েছে, যে সকল কর্মকর্তা গাড়ি ব্যবহার করবে তার স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে। এখন কর্মকর্তাদের নিকট হতে জোর করে স্বাক্ষর আদায় করা হয়। যদি কোনো কর্মকর্তা স্বাক্ষর প্রদান না করতে চায় তার গাড়ি বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেওয়া হয়। কোনো কোনো গাড়ি মেরামত না করেও তার জন্য বিল বানিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। যেহেতু এখানে গাড়ি মেরামত ও তেল, গ্যাস বাবদ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রয়েছে সেহেতু তারা এই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন না হলেও ভুয়া ভাউচার বানিয়ে ব্যয় দেখিয়ে আত্মসাৎ করে।

পরিবহন খাতে দুর্নীতির আর একটি ক্ষেত্র হচ্ছে বিভিন্ন প্রকল্পে গাড়ি ব্যবহার। প্রকল্পের গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রকল্প প্রস্তাবনায় গাড়ি ক্রয় করার বিষয়টি উল্লেখ না রেখে ভাড়া নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন রেন্ট এ কারের নিকট থেকে গাড়ি ভাড়া দেখানো হয় এবং এই ভাড়া বাবদ প্রায় প্রতি মাসে গাড়ি প্রতি ৫০ হাজার টাকা ব্যয় দেখানো হয়। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে এই গাড়িগুলো রেন্ট এ কারের সাথে যোগসাজশে পুরো টাকাই আত্মসাৎ করা হয়। শুধু নথিপত্রে এই গাড়ির অস্তিত্ব দেখানো হয়। কখনও প্রয়োজন হলে রেন্ট এ কারকে এক-দুই বার গাড়ি দেখিয়ে যেতে বলা হয় কিন্তু ব্যবহার করা হয় না। এভাবে কোনো প্রকল্পে যদি একটি গাড়ি ৫ বছর চালানো হয় সেক্ষেত্রে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ভাড়া ও জ্বালানী ব্যয় দেখানো হয় যার পুরোটাই আত্মসাৎ করা হয়। প্রকল্পের ক্ষেত্রে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাগণ গাড়ি পাওয়ার উপযুক্ত না হলেও তাদের গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। কারণ ভাড়াকৃত গাড়ি ব্যবহারের বিল পাশ করার ক্ষেত্রে এই হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর প্রয়োজন হয়।

অন্যদিকে প্রতিটি বিভাগীয় প্রকৌশলীর অফিসগুলোতে সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলীর উপরে কর্মরত সকল কর্মকর্তাগণ বিটিসিএলের গাড়ি ব্যবহার করে থাকে। এদের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ গাড়িই তাদের পরিবারের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। এসব গাড়ির ড্রাইভারদের মাসিক ১৬০ ঘন্টা থেকে ১৮০ ঘন্টা পর্যন্ত ওভারটাইম বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করতে হয়। এছাড়া প্রতি এক মাস পর পর গাড়ি প্রতি ১৫০০০ টাকা মেরামতের জন্য প্রদান করতে হয়। সিএনজি চালিত গাড়িগুলোতে প্রতিমাসে ৩০লিটার তেল অতিরিক্ত প্রদান করতে হয়। কর্মকর্তাগণ এসব সুবিধা ড্রাইভারদের না দিতে চাইলেই সিবিএর সহায়তায় ঘেরাও, টেবিল চাপড়ানো অথবা বদলি করে দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ম্যানেজ করতে পারে না বলা হয়।

৭.৭ সিবিএর হস্তক্ষেপ এবং অনৈতিক কার্যক্রম

এখনও পর্যন্ত সিবিএ নানা ভাবে বিটিসিএল এর কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করে। বেশিরভাগ পদায়ন, বদলি তাদের ইচ্ছানুযায়ী করতে হয়। যেখানে বিটিসিএল কার্যালয়ের নীচ তলায় ইউটিলিটি সার্ভিস পয়েন্ট, কাস্টমার কেয়ার সেন্টার হওয়ার কথা সেখানে পুরো নীচতলাটি দখল করে আছে সিবিএ নেতাগণ। তাদের ইচ্ছেমত বাসা বরাদ্দ করা না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নাজেহাল হতে হয়। এদের দৌরাত্ম এত বেশি যে, তারা যেকোনো দাবিতে কর্মকর্তাদের কার্যালয় ঘেরাও, দাবি মানতে নানা রকম হুমকি, টেবিল চাপড়ানো, মারধর করাসহ বিভিন্ন অশোভন আচরণ করে। তাদের সামনে অনেক ক্ষেত্রেই কর্মকর্তাগণ অসহায় থাকেন। নিম্নে তাদের হস্তক্ষেপের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো-

- আগে যেখানে সরাসরি এমডি বা মেম্বারদের কাছে ফাইল নিয়ে যাওয়া যেত সেখানে বর্তমানে সিবিএ নেতাগণের সিদ্ধান্তে সরাসরি ফাইল নিয়ে যাওয়া যায় না। কর্মকর্তাদের পিএ'র মাধ্যমে যেতে হয়। এই পিএ পদে সিবিএ নেতারা তাদের নিজেদের লোক বসিয়েছে। সেখানে তারা প্রতিটি ফাইল খুলে দেখে এবং ক্ষেত্র বিশেষে তারা সাপ্লায়ার বা কন্ট্রাক্টরদের সিবিএ তহবিলে টাকা দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। টাকা প্রদান না করা হলে ফাইল কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছানো হবে না বলে হুমকি প্রদান করে।

বক্স ২: সিবিএর দুর্নীতির ফলে কর্মকর্তার হয়রানি

একবার সিবিএ'র কিছু নেতা অবৈধভাবে কিছু আবাসন অনুমোদন দেবার জন্য ঢাকা সেন্ট্রাল এর জিএম কে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। এই জিএম কর্মচারীদের আবাসন অনুমোদন করে থাকেন। উক্ত জিএম অবৈধভাবে আবাসন অনুমোদন দিতে রাজি হননি বলে প্রায় ১০/২০ জন সিবিএ নেতা তাকে বেদম মারধর করে। ফলশ্রুতিতে তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। সিবিএ নেতাগণ মারধর করেই ক্ষান্ত হয়নি, এ বিষয়ে তারা মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করে এবং ওই কর্মকর্তাকে অন্য জায়গায় বদলি করে দেবার ব্যপারে সুপারিশ প্রদান করে। মন্ত্রণালয়ও উক্ত সুপারিশ মোতাবেক তাকে অন্য জায়গায় বদলি করে দেয়। তথ্যসূত্র: মূখ্যতথ্যদাতা

- গাড়িতে মেইন্টেনেন্স খরচ বাবদ সর্বনিম্ন ২০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা দেখানো হয়। এতে স্বাক্ষর না দিলে সিবিএ নেতাদের হস্তক্ষেপে গাড়ি বন্ধ হয়ে যায় এবং কর্মকর্তাদের ওপর হামলা করা হয়।
- কোম্পানির খালি জায়গায় তারা ঘর তুলে ভাড়া দেয়।
- অনেকে সিবিএ নেতাকে টাকা দিয়ে বাসা বরাদ্দ গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তারা সেটাতে বাইরের লোক ভাড়া দেয়। কর্মচারীরা বাসা বরাদ্দ নিতে চাইলে সিবিএকে চাঁদা দিতে হয়। অবৈধ টাকা গ্রহণ করে সিবিএ নেতাগণ অবৈধ আবাসন অনুমোদন দেবার জন্য প্রশাসনে চাপ প্রয়োগ করে।
- সিবিএর অনৈতিক কার্যক্রমের উপরে সহকারী পরিচালক, নিরীক্ষা ও হিসাব কোনো একটি ফাইলে আপত্তি দিলে সে ফাইল সিবিএ নেতাগণ তার রুমে এসে ছিড়ে ফেলে এবং তাকে লাঞ্ছিত করে। সিবিএ'র চাপে সেদিনই তাকে শেরে বাংলা নগর শাখায় বদলি করা হয়।
- কয়েকজন কর্মচারী গ্রাহকদের নিকট থেকে ১০-২০ হাজার টাকা করে গ্রহণ করে এবং জাল চেক তৈরী করে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নেয়। শেরেবাংলা নগর শাখার জিএম তখন তাদের সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করে। সে কর্মচারীদের পক্ষে তখন সিবিএ নেতারা তার অফিস ঘেরাও করে। এ প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয় থেকে হস্তক্ষেপ করে তাকে সরিয়ে 'টেলিটক' এর এমডি করা হয়।
- সিবিএর এক নেতা সিলেটের গেষ্ট হাউজ বুকিং চাইলে সিলেটের এক অফিসার গেষ্ট হাউজ খালি নেই বিধায় তাকে বুকিং দিতে অপারগতা জানালে সে সিবিএ নেতা জিএম এর সাথে কথা বলে উক্ত কর্মকর্তাকে চাকুরিচ্যুত করতে বলে। তখন জিএম লিয়েন অর্ডার করে তাকে টেলিটকে পাঠিয়ে দেয়।
- বিটিসিএল এর দুর্নীতিগ্রস্ত সকল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দুর্নীতির সাথে সিবিএ জড়িত রয়েছে। প্রত্যেক বিভাগীয় প্রকৌশলীই সিবিএকে ঘুষ দিতে বাধ্য হয়। প্রতিটি বিভাগীয় প্রকৌশলীর অফিস থেকে সিবিএ ইউনিটকে মাসিক ৩০০০ থেকে ৫০০০ টাকা প্রদান করতে হয়। আর এই টাকা না দিলেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে লিফলেট বিতরণ ও তাকে মারধর করা হয়।
- লাইন মেরামতের বিষয়টি পূর্বের ন্যায় সিবিএ'র নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এখানে তারা লাইন মেরামত করার জন্য প্রতিনিয়ত গ্রাহকদের হয়রানি করে তাদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করে। এসব নেতারা কোনো কাজ করতে চায় না। টেলিফোনে অভিযোগ আসলেও দিনের পর দিন তার জন্য কোনো পদক্ষেপ নেয় না।

৭.৮ বাড়ি এবং রেস্ট হাউস ব্যবহারে অনিয়ম

সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলীদের জন্য যে বাসা বরাদ্দ রয়েছে সে বাসাগুলোতে পরিচালক, বিভাগীয় প্রকৌশলী ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাগণ দখল করে আছে। যেহেতু এই বাসাগুলোর জন্য মাত্র ৩০০ টাকা ভাড়া দিতে হয় সেহেতু এসব কর্মকর্তাগণ তাদের জন্য বরাদ্দকৃত বাসায় বেশি ভাড়া দিয়ে থাকতে চায় না। অথচ তারা বিটিসিএল থেকে তাদের পদমর্যাদা অনুসারেই বাসা ভাড়া গ্রহণ করে থাকে।

আবার বিটিসিএলের কর্মকর্তা বা কর্মচারী না হয়েও এর কিছু বাসা ও রেস্টহাউস অবৈধভাবে দখল করে আছে। পূর্বের একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক চাকরিচ্যুত অবস্থায় জিএম এর বাসায় সাত বছর অবৈধভাবে বসবাস করে। বিটিসিএলের অনেক কর্মকর্তা টেলিটকে যাওয়ার পরেও বিটিসিএলের বাসায় অবস্থান করে। একই সাথে তারা টেলিটক থেকেও বাড়ি ভাড়া গ্রহণ করছে। বর্তমানে প্রায় ১০ জন কর্মকর্তা এ ধরনের বাসায় অবস্থান করছে।

৭.৯ প্রাইভেট টেলিযোগাযোগ কোম্পানির অবৈধ প্রভাবে বিটিসিএল কর্তৃক অবৈধ সুবিধা প্রদান

বিটিসিএলের লাভজনক অবস্থানে পৌছাতে না পারার একটি বড় বাধা হচ্ছে প্রাইভেট মোবাইল, আইজিডব্লিউ, আইআইজি আইএসপিসহ বিভিন্ন বড় টেলিযোগাযোগ কোম্পানিগুলোর প্রভাব। এসব কোম্পানি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের যেমন মন্ত্রী, রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তি, মন্ত্রণালয় ও বিটিআরসির কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে বিটিসিএলকে কার্যকর করার বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে। টেলিযোগাযোগ নীতিমালাগুলোও তাদের স্বার্থে অপপ্রয়োগের মাধ্যমে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে।

অন্যদিকে এসব কোম্পানি বিটিসিএলের কর্মকর্তাদের যোগসাজশে অবৈধভাবে বিটিসিএলের অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে লাভবান হচ্ছে। বিটিসিএলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারি টেলিযোগাযোগ কোম্পানিতে কর্মরত রয়েছেন। এসব কর্মকর্তা বিটিসিএলের প্রতিটি শাখার কার্যক্রম ও খুটিনাটি সম্পর্কে অবগত। এসব কর্মকর্তাগণ বিটিসিএলের অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে তার কোম্পানিকে সুবিধা দিয়ে থাকে। তারা নিজের কোম্পানির সুবিধা দানের জন্য বিটিসএলের জুনিয়র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোনো কাজে আদেশ দিলে নিম্ন পর্যায়ের স্টাফরা তা এড়াতে পারে না। শুধু প্রাক্তন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে নয় বিটিসিএলের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে প্রাইভেট কোম্পানিগুলো বিটিসিএলের বিভিন্নরকম সুবিধা প্রদান করছে। এভাবে ঢাকার মহাখালি, মগবাজার অফিসসহ উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত প্রাইভেট টেলিযোগাযোগ কোম্পানিগুলো বিটিসিএলের সুবিধা নিয়ে লাভবান হচ্ছে অথচ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে বিটিসিএল। উল্লেখ্য প্রাইভেট কোম্পানিগুলোকে এভাবে অবৈধ সুবিধা প্রদান করার অভিযোগে ইতিমধ্যে বিটিসিএলের খুলনা, সিলেট এবং পাবনা কার্যালয়ের তিনজন কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।

৮. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিটিসিএলকে দীর্ঘদিন ধরে কোম্পানি হিসেবে ঘোষণা হলেও সঠিক, কার্যকর ও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানির মত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে না। সরকারি বিভিন্ন নীতিমালার কারণেও বিটিসিএল লাভজনক অবস্থায় যেতে পারছে না।

এছাড়াও বিটিসিএলে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে নতুন অর্গানোগ্রাম কার্যকর না হওয়া, সমন্বয়হীন জনবল, মন্ত্রণালয় নির্ভর পরিচালনা বোর্ড, সরকারি প্রতিষ্ঠানের ন্যায় নিয়ম কানুন অনুসরণ করা, আধুনিক সেবা প্রদানে ব্যর্থতা এবং অভ্যন্তরীণ অনিয়ম দুর্নীতির উপস্থিতি। এসব সমস্যার ফলে দেখা যাচ্ছে বিটিসিএল কোম্পানি কিংবা পূর্বের বিটিটিবি কোনটির ন্যায়ই কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে না।

চিত্র ৩: সমস্যার ধরন, ফলাফল ও প্রভাব

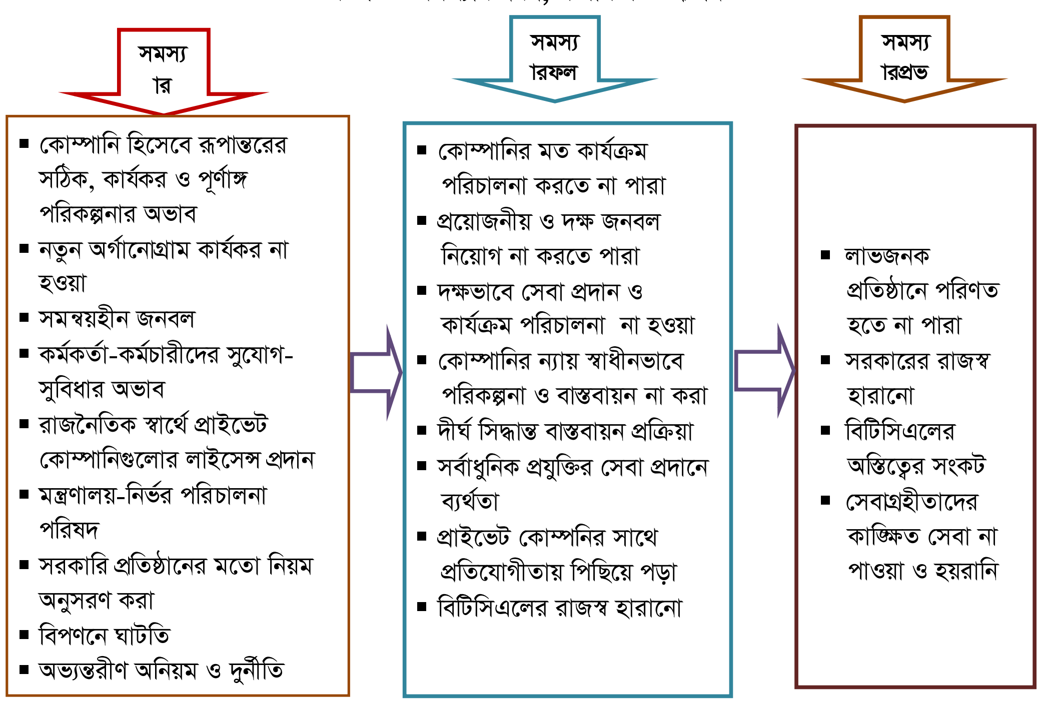

আবার বিরাজমান সমস্যার কারণে প্রয়োজনীয় ও দক্ষ লোক নিয়োগ করা যাচ্ছে না, স্বাধীনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারছে না, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হচ্ছে, প্রাইভেট কোম্পানি সাথে প্রতিযোগীতায় পিছিয়ে পড়ছে, দক্ষভাবে সেবা প্রদান ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে না এবং রাজস্ব হারাচ্ছে। এসব সমস্যার প্রভাবে দেখা যাচ্ছে গ্রাহক কাঙ্ক্ষিত

সেবা পাচ্ছে না এবং হয়রানির শিকার হচ্ছে, বিটিসিএল লাভজনক অবস্থানে পৌছাতে পারছে না এবং প্রতিষ্ঠানটি অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে। অন্যদিকে সরকার হারাচ্ছে বড় অংকের রাজস্ব।

সুপারিশ:

টিআইবি আগামী ৬ মাসের মধ্যে বিটিসিএলকে সম্পূর্ণ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ন্যায় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুপারিশ করছে। এই সুপারিশটি কার্যকর করা ও উপরের সমস্যাসমূহ দূর করার জন্য টিআইবি বিটিসিএলের প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কার এবং গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে আরো কিছু সুপারিশ প্রদান করছে যার মাধ্যমে টিআইবি মনে করছে বিটিসিএল কার্যকর পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়ে লাভজনক অবস্থানে পৌছাতে পারবে এবং এখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে।

ক. প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কারে সুপারিশ

১. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে বিটিসিএলকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে এর পরিচালনা বোর্ডের ওপরে মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ কমাতে হবে। বোর্ডের সদস্যদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দিতে হবে। বিটিসিএলের পরিচালনা বোর্ড টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা ও প্রশাসন সফল বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠন করতে হবে। আয় ব্যয়ের ক্ষমতাসহ পুরোপুরি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বোর্ডের থাকতে হবে, বোর্ডের সদস্যদের হতে হবে পক্ষপাতহীন।

২. বিটিসিএল, টেলিটক এবং বিএসসিসিএল (সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লি.) -এই তিনটি কোম্পানিকে একত্রীভূত করে একটি কোম্পানিতে রূপান্তর করতে হবে।

৩. যত দ্রুত সম্ভব বাজারে শেয়ার ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. বিটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে, বিশেষ করে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, পদমর্যাদা এবং সুনির্দিষ্ট মেয়াদকাল কমপক্ষে তিন বছর নির্ধারণ করতে হবে।

৫. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা ও পদায়নের জটিলতা দূর করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকার প্রক্রিয়াধীন 'ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশন্স' (ডট) গঠন সম্পন্ন করার মাধ্যমে পদক্ষেপ নিতে পারে/ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে আত্তীকরণ করতে পারে/কর্মকর্ত-কর্মচারীদের বর্তমানে প্রাপ্য ও পরবর্তী সময়ের চাকরির জন্য প্রাপ্য সকল সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিতে পারে।

৬. নিয়োগের নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করে দ্রুত নতুন অর্গানোগ্রাম অনুসারে লোকবল নিয়োগ দিতে হবে।

৭. বিটিসিএল-এর নিজস্ব ক্রয়নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৮. বিটিআরসিকে আইজিডব্লিউ অপারেটরদের অভিন্ন প্লাটফরমের নিয়ন্ত্রণে এনে ব্যবসা পরিচালনা করতে দিতে হবে।

৯. সরকারের উন্নয়নমূলক নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য বিটিসিএলের একটি আলাদা ইউনিট গঠন যার কার্যক্রম মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে না হয়ে, সেবামূলক উদ্দেশ্যে করা হবে। এ জন্য সরকার থেকে তহবিলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১০. রাজস্ব বৃদ্ধির বাস্তবমুখী টার্গেট গ্রহণ করে সে সম্পর্কে কোম্পানির প্রতিটি স্তরের কর্মীদের মধ্যে প্রণোদনা তৈরি করতে হবে। টার্গেট পূরণে ব্যর্থ হলে তার কারণ চিহ্নিত করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

১১. ট্রেড ইউনিয়নকে শ্রমিক কল্যাণে কাজ করতে হবে এবং রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি বন্ধ করতে হবে।

১২. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে আধুনিকায়ন করার পাশাপাশি বিটিসিএলে একটি 'গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করতে হবে যার মাধ্যমে বাজার যাচাই করে বিটিসিএল'র সেবা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

১৩. নিরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্য প্রয়োজনীয় শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. বছরে একবার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদের হিসাব ও বিবরণ প্রকাশ করতে হবে এবং তা যাচাই করতে হবে। বৈধ সূত্রের বাইরে অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত আয় বা সম্পদ আহরণ বা অন্য কোনোরূপ দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৫. বিটিসিএল'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি নৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়ন করতে হবে। এর সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে যোগ্য ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে একটি 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন করতে হবে। দুর্নীতি ও অনিয়মসহ সকল প্রকার নৈতিক আচরণবিধি লঙ্ঘনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এই কমিটির নিকট তাদের অভিযোগ দাখিল করবেন এবং কমিটি তা যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে যেখানে সিবিএ বা রাজনৈতিক কোনো প্রভাব থাকবে না।

খ. গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে সুপারিশ

১৬. যত দ্রুত সম্ভব কপার ক্যাবল এর পরিবর্তে অপটিক্যাল ফাইবার বা তার বিহীন লুপ টেলিফোনের মাধ্যমে গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ দিতে হবে।

১৭. দাবিনামা প্রাপ্তি, সংযোগ ও টেলিফোন স্থানান্তর সেবা বিনামূল্যে দিতে হবে।

১৮. গ্রাহকদের টেলিফোনে যেন কোনো সমস্যা তৈরি না হয় সেদিকে সর্বদা খেয়াল রাখতে ওয়ার্ডভিত্তিক পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করতে হবে। আবার যেসব লাইনের বিল বকেয়া রয়েছে সেগুলোর বিষয়েও নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৯. আধুনিক বিলিং ব্যবস্থা যেমন, আইটেমাইজড বিল চালু করতে হবে। প্রতিটি গ্রাহকের নিকট যেন নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে বিল পৌঁছানো যায় সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সকল স্থানে প্রিপ্রেইড কার্ডের মাধ্যমে বিল দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করতে হবে। বিল সংক্রান্ত গ্রাহক হয়রানি কমাতে ও ব্যাংক, রাজস্ব অফিস এবং টেলিফোন অফিসের সমন্বয়হীনতা দূর করতে সব এলাকায় ওয়ান স্টপ ও অনলাইন সেবা চালু করতে হবে।

২০. বিটিসিএল প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে জনগণকে আগ্রহী করতে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে ও বিভিন্ন রকমের আকর্ষণীয় প্যাকেজ দিতে হবে।

২১. কাস্টমার কেয়ার এবং হেল্প ডেস্ক চালু করতে হবে এবং কাস্টমার সেবা দেওয়ার জন্য সর্বদা লোক থাকতে হবে। কাস্টমারদের ফিডব্যাক গ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১. বিটিটিবি ও বিটিসিএলের রাজস্বের চিত্র

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা)	মোট আয় (কোটি টাকা)	ব্যয় (কোটি টাকা)	উদ্বৃত্ত (কোটি টাকা)
২০০০-২০০১	১৬০০	১২৬৫.১১	৩৯০.৪৫	৮৭৪.৬৬
২০০১-২০০২	১৬০৩	১৫৮৩.০৫	৪৬৩.৫৪	১১১৯.৫১
২০০২-২০০৩	১৬০২	১৫৪৪.৮০	৫৮৮.৪৩	৯৫৬.৩৭
২০০৩-২০০৪	১৭০২	১৫৩১.১৫	৬০৯.০২	৯২২.১৩
২০০৪-২০০৫	১৬৫০	১৪২৪.৭৮	৮১৮.৯২	৬০৫.৮৬
২০০৫-২০০৬	১৭৭২	১৩১৬.২৮	৮২৪.৫৬	৪৯১.৭৪
২০০৬-২০০৭	১৯০৩	১৬৬৬.৭১	৯২৮.৫১	৭৪২.২
২০০৭-২০০৮	১৯২৭	১৫৬৫.৩৩	১৭৫৪.৯১	-১৮৯.৫৮
২০০৮-২০০৯	১৫০০	২১০৮.৫১	৬৬২.৪৭	১৪৪৬.০৪
২০০৯-২০১০	১৫৮৩	১২৮৩.৭৮	১৩৫১.৬৯	-৬৭.৯১
২০১০-২০১১	১৫৬৬	১৩৮৬.৯১	১২৩৬.৫৫	১৫০.৩৬
২০১১-২০১২	১৭৬০	১৭০২.৯২	১৪৩৪.৬৫	২৬৮.২৭
২০১২-২০১৩	২৪৯৮	১০৫৬	১৬০২	-৫৪৬

পরিশিষ্ট ২: **বিটিসিএলের টেলিফোন গ্রাহক সংখ্যা**

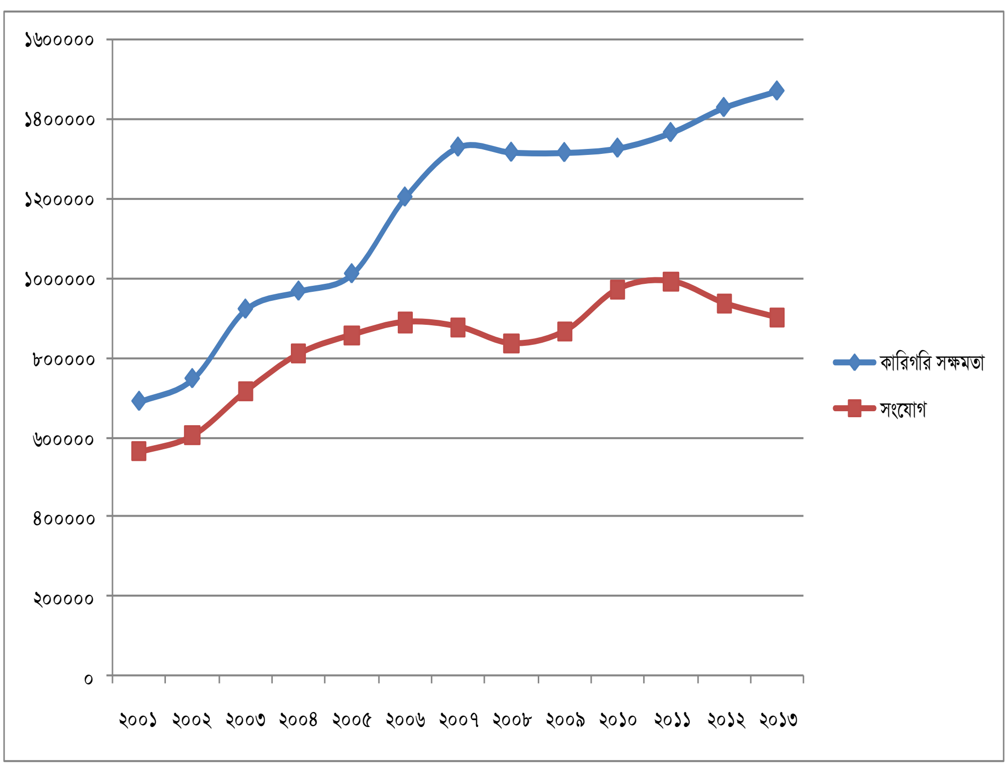

পরিশিষ্ট ৩: **ডট পাশের ধাপসমূহ (রঙ্গীন ধাপগুলোর অনুমোদন সম্পন্ন হয়েছে)**

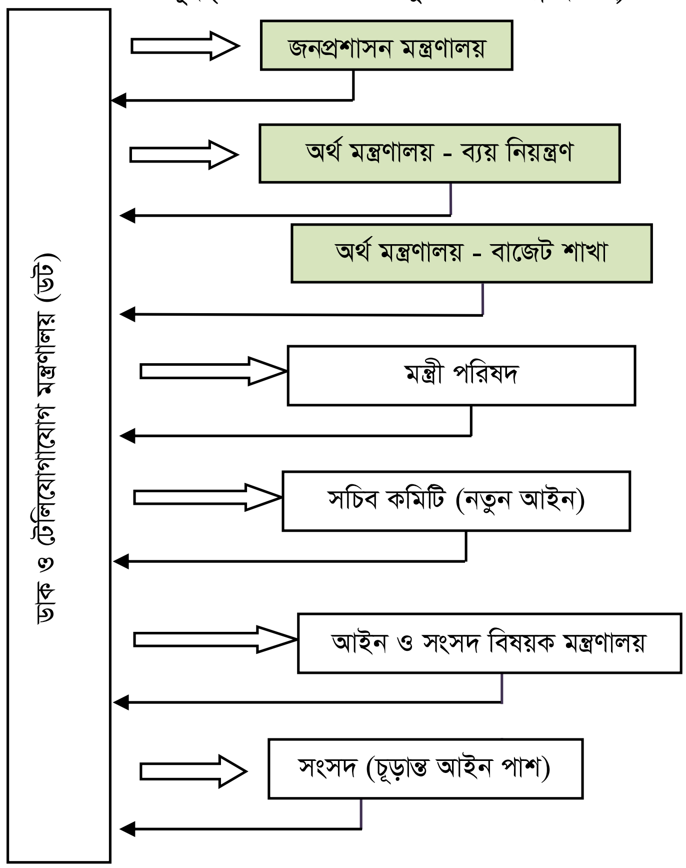

পরিশিষ্ট ৪: আন্তর্জাতিক কল আদান প্রদানের চিত্র

সন	বিদেশ থকে আসা কল (মিনিট)	বিদেশে পঠানো কল (মিনিট)	মোট (মিনিট)
২০০৯	২,৭৬৪,৮৫৪,১৮৬	২৮১,৮৩৩৭৪৩	৩,০৪৬,৬৮৭,৯২৯
২০১০	৩,৫৬৮,৬৪৯৭৭১	২৩৯,৮৫৮,৩১২	৩,৮০৮,৫০৮,০৮৩
২০১১	৫,৭৯৮,৪৩৪,৬০৯	১৫১,৮৬৭৯৬৮৩	৭,৩১৭,১১৪,২৯২
২০১২	৩,৭৩০,১৮৪,০৯৪	৯৮৪৯০৩৬৬	৩,৮২৮,৬৭৪,৪৬০
২০১৩	২,০৯২,০৩৬,৬২০	৩৭৫৩২৬৯২	২,১২৯,৫৬৯,৩১৩

উৎস: *বিটিসিএল*

পরিশিষ্ট ৫: ভিওআইপি কি?

ভিওআইপি এর পূর্ণরূপ- ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল (Voice Over Internet Protocol)। ভিওআইপি মূলত এক প্রকার টেলিফোন প্রযুক্তি যা ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে কল ও ডাটা আদান প্রদানের সুবিধা প্রধান করে। ভিওআইপিতে ডাটা প্রেরণের জন্য সাধারনত টেলিফোন লাইনের পরিবর্তে ইন্টারনেট প্রটোকল ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে এর মাধ্যমে ডিজিটাল ডাটা প্রেরণ করা হয়। ভিওআইপিতে প্রচলিত সার্কিট সুইচ্‌ড ভয়েস ট্রান্সমিশন লাইনের পরিবর্তে প্যাকেট সুইচ্‌ড নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভয়েস ডেটা ট্রান্সমিট হয়। এই পদ্ধতিতে এনালগ অডিও সিগনাল গ্রহণ করে তা ডিজিটাল সিগনালে রূপান্তরিত করে যা ইন্টারনেট প্রটোকল (প্যাকেট) ব্যবহারে ট্রান্সমিট হয়। এটি ব্যবহারের জন্য প্রথমত কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগে, VoIP সফ্টওয়ার এর প্রয়োজন হয়। এছাড়া মাইক্রোফোন, অ্যানালগ টেলিফোন অ্যাডাপ্টর অথবা ভিওআইপি টেলিফোন প্রয়োজন হয়।

তথ্যসূত্রঃ

১. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি), ২২ জানুয়ারি ২০১৪
২. দৈনিক জনকন্ঠ, ২৯ মার্চ ২০১১, অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে অবৈধ ভিওআইপি, নেমে এসেছে বৈধ কল
৩. নয়া দিগন্ত, ২৭ জানুয়ারি ২০১২, ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়ে ভিওআইপি ব্যবসা
৪. কালের কণ্ঠ, ২৭ ডিসেম্বর ২০১২, বিটিসিএল এ গ্রাহকদের বিল হঠাৎ করে দ্বিগুণ
৫. বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৯-১০, ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২, বংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)
৬. বিটিসিএলের ওয়েবসাইট, http://www.btcl.gov.bd/, ২৪ মার্চ ২০১৪
৭. সংবাদ সম্মেলন, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড, ৩০ জুন ২০০৮
৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ জুলাই ২০০৮, বিটিসিএল এর সম্পদের চেয়ে দায় বেশি ৪ হাজার ২৩৭ কোটি টাকা
৯. ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, অধিশাখা -২ এর প্রজ্ঞাপন, স্মারক নং-পিটি/শাখা-২/১ই-৬/৯৭(অংশ)-২০০, ০৯ এপ্রিল ২০০৯
১০. Prof. Mirza Golam Rashed, VoIP: A Technological Gift for the Third World Perspective: Bangladesh, June 2011. http://www.comjagat.com/archive/articleimage/2011_06_57_VoIP_A_Technological_Gift.pdf , ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩
১১. http://www.dot.gov.in/sites/default/files/Telecom%20Annual%20Report-2012-13%20%28English%29%20_For%20web%20%281%29.pdf, ২২ জানুয়ারি ২০১৪
১২. http://mtnl.in/ufr_191113.jpg, ২২ জানুয়ারি ২০১৪